# পেশোয়ার থেকে মীরাট

সৌম্য চট্টোপাধ্যায়

# পেশোয়ার থেকে মীরাট

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বনাম
ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক :
কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনীর পক্ষে
সুকুমার গুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান :
মনীষা গ্রন্থালয়,
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

এবং

কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশনী
২০৮, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক :
কালান্তর প্রেস
৩০/৬, ঝাউতলা রোড
কলকাতা-১৭

দাম : আট টাকা

# উৎসর্গ

ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে সমস্ত বীর
কমিউনিস্ট বিগত ৬০ বছর ধরে আত্মদান করেছেন,
তাঁদের মহান স্মৃতির উদ্দেশ্যে

# সূচীপত্র

# মুখবন্ধ

১৯১৭-র নভেম্বরে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই, আতঙ্কিত সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বজুড়ে রব তুলেছিল : গেল, গেল, সব গেল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৎকালীন মুখপত্র, কলকাতার স্টেটসম্যান লিখেছিল : "প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইতিহাসে যতরকম বিপ্লবী প্রচেষ্টা হয়েছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ও সর্বাত্মক হচ্ছে রাশিয়ার নতুন বিপ্লবী সরকারের কার্যকলাপ।" (স্টেটসম্যান, কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর, ১৯১৭) আর ইংরেজ গোয়েন্দা চূড়ামনি সেসিলকে তাঁর গোপন রিপোর্টে বড়লাটকে জানালেন : "ভারতবর্ষে বিপ্লব নিশ্চয় লেনিনের কাম্য, তবে আমার মনে হয়, যে লেনিন চাইছেন যে ভারতে বিক্ষোভ তার নিজস্ব ভঙ্গীতেই এগিয়ে চলুক।" (হোম/পল্/এফ. এন : ৪৫-৪৬, জানুয়ারি, ১৯২১)

ভারতের তরুণ মুক্তি সংগ্রামীদের অগ্রণী অংশ প্রথম দিন থেকেই সাদর অভিনন্দন জানিয়েছেন রুশ বিপ্লবকে, বুঝতে চেয়েছেন কমিউনিস্ট আদর্শকে। ১৯২০-তে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ভারতীয় বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অবনী মুখার্জি ও তিরুমল আচার্য। ঐ বছরই অক্টোবরে, তাসখন্দে তাঁরা ও আর কয়েকজন মিলে পত্তন করেন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তিকে।

১৯২১-এ আমেদাবাদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে, সমস্ত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিতরণ করা হয় মানবেন্দ্রনাথ রায় ও অবনী মুখার্জির স্বাক্ষর করা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো। তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে গণবিপ্লবের জোরে উচ্ছেদ করে, ভারতে পূর্ণ স্বাধীন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার, বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করে চাষীর হাতে জমি দেবার ও প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীকে ভোট দানের মূল দাবী করা ছিল।

বামপন্থী খিলাফৎ নেতা মৌলানা হসরত মোহানি, কমিউনিস্টদের দাবীকে সংশোধনের আকারে কংগ্রেস অধিবেশনে পেশ করেন। তাঁকে সমর্থন জানান ফেরারী বাঙালি বিপ্লবী স্বামী কুমারানন্দ (পরে রাজস্থানে

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা)। গান্ধীজি ও দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিরোধিতায় পরাজিত হয় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সম্বলিত সংশোধনীটি।

এইভাবে ১৯২০-২১ থেকেই শুরু হয় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও মেহনতী জনগণের পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন। আর অঙ্কুরেই সেই কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য অবিশ্রান্ত আক্রমণ চালিয়ে যায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। অজস্র ষড়যন্ত্র মামলা করে তারা চেষ্টা করে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নির্মূল করতে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ যত আক্রমণ করেছে, ভারতের মেহনতী জনগণ ও গণতান্ত্রিক মানুষেরা তত বুক দিয়ে রক্ষা করেছেন শিশু কমিউনিস্ট আন্দোলনকে। তাই সে দিনের অঙ্কুর আজ মহীরূহ।

১৯২১ থেকে ১৯২৩ ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত রাজ্যের রাজধানী পেশোয়ারে চলেছিল ধারাবাহিক বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা। তারপর এল কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা। তারপর ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ চার বছর ধরে চলে ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা।

আজ ১৯৮৪-তে যখন সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহকরা সমানে চালিয়ে যাচ্ছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার, প্রশ্ন করছে তাদের দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী অতীতকে, তখন সংক্ষেপে, সহজ ভাষায়, অথচ অকাট্য তথ্য-প্রমাণসহ, এ যুগের তরুণ কর্মীদের হাতে তুলে দেবার প্রয়োজন আছে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ঐতিহ্যকে। সেই উদ্দেশ্যেই রচিত হল পেশোয়ার থেকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

পরিশিষ্ট ও এই মুখবন্ধটি বাদে, বই-এর বাকী সবটাই ১৯৮৩-৮৪-তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল "সাপ্তাহিক কালান্তর"-এ। এখন সমগ্র রচনাটি প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পার্টির রাজ্য নেতৃত্ব। আশা করব পার্টির নবীন কর্মীদের ও সমগ্র কমিউনিস্ট আন্দোলনেরই এটি কাজে লাগবে।

২ পাম প্লেস
কলিকাতা—৭০০০১৯
১৭ নভেম্বর ১৯৮৪

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

# পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (এখন পাকিস্তানে) পাঠানদের দেশ আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থিত। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল, চারিদিকে ছোট বড় গিরিবর্ত্ম। ফলে পাঠানদের সঙ্গে আফগান ভাইদের সংযোগ ছিল খুবই নিবিড়। পেশোয়ার থেকে কাবুল যাওয়া, ইংরেজদের বিধিনিষেধ এড়িয়ে, খুব একটা কঠিন কাজ ছিল না। ভারতের জাতীয় বিপ্লববাদীরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বপ্ন দেখলেন: কাবুলকে ঘাঁটি করে ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম চালাবেন। উত্তর ভারতের মুসলমানদের মধ্যে দেশপ্রেমিক ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা ছড়াবার প্রাণকেন্দ্র ছিল দেওবন্ধের শিক্ষাকেন্দ্র। তার অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত মাহমুদ-উল হাসান ছিলেন খুবই দেশপ্রেমিক এবং দেওবন্ধের অপর একজন শিক্ষক মৌলানা ওবাইদুল্লা সিন্ধি ছিলেন আপসহীন বিপ্লবী। মাহমুদ শীঘ্রই ওবাইদুল্লার অনুরক্ত হয়ে পড়লেন এবং বহু ছাত্রও তাঁকে অনুসরণ করল। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আবদুল গফফর খান, যিনি পরবর্তীকালে পাঠান জনগণের মুক্তিসাধনার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠলেন।

## ওবাইদুল্লা সিন্ধির বিদ্রোহ প্রচেষ্টা

বহুদিন পরে তাঁর স্মৃতিচারণে আবদুল গফফর খান লিখছেন যে দেওবন্ধের বহু ছাত্রই মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত অধ্যক্ষ মাহমুদ-উল-হাসান ও মৌলানা ওবাইদুল্লা সিন্ধিকে, কারণ ঐ দুটি মানুষের ধ্যানজ্ঞান ছিল "কি করে বিদেশী দাসত্বশৃংখল থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করা এবং তাঁদের প্রভাবে আমাদেরও ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়াল দেশের মুক্তি অর্জন করা।" (বাদশা খান: মাই লাইফ অ্যাণ্ড স্ট্রাগল, ওরিয়েন্ট পেপারব্যাক, ১৯৬৯, পৃঃ ৩০)

১৯১৫-র মধ্যভাগে ওবাইদুল্লা সিন্ধি তাঁর তিন বন্ধু, আবদুল্লা, ফতে মহম্মদ ও মহম্মদ আলিকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পেরিয়ে, বালুচিস্থান—পারস্য সীমান্তে যোগাযোগ করলেন পুরানো ওয়াহাবি বিদ্রোহীদের সঙ্গে। তাঁরা পরিকল্পনা করলেন যে সমগ্র উত্তর-

পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ জুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র গণ অভ্যুত্থান সংগঠিত করবেন। একমাস পরে তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন অধ্যক্ষ মাহমুদ-উল হাসান এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু। (সিডিশন কমিটির রিপোর্ট, ১৯১৮, পৃঃ ১৭৬-৭৭)।

## কাবুলে "স্বাধীন ভারতীয় সরকার" গঠন

ইতিমধ্যে আর একদল ভারতীয় বিপ্লবী (বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ) বার্লিনে ভারতের স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছেন। জার্মান সরকারের সহায়তায় তাঁরা কাবুলে এক শক্তিশালী প্রতিনিধি দল পাঠালেন, যাদের নেতৃত্ব করলেন দুই প্রসিদ্ধ বিপ্লবী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও মৌলানা বরকতুল্লাহ। মহেন্দ্রপ্রতাপ লিখছেন: "১৯১০-র আগস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা হেরাটে পৌঁছলাম ও আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানানো হল। ১৯১৫-র ২রা অক্টোবরে আমরা কাবুল পৌঁছলাম··· কিছু দিনের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন ভারতীয় মুসলমানদের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী নেতা মৌলানা ওবাইদুল্লাহ" (মূল পাণ্ডুলিপি বার্লিনে সংরক্ষিত। এই উদ্ধৃতিটি নেওয়া চিন্মোহন সেহানবীশ: রুশ বিপ্লব ও ভারতীয় বিপ্লবী ১৯৭৩, পৃঃ ২৯৮-৯৯ থেকে)

এইভাবে সংযোগ হল ভারতে বিপ্লব সাধনার তিনটি ধারার—বাঙলার বিপ্লববাদী ধারা, গদর বিপ্লবীদের উদ্যম ও উত্তর ভারতের মুসলমান বিপ্লবী-প্রচেষ্টা। ১৯১৫-র অক্টোবরেই কাবুলে গঠিত হল স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার। মহেন্দ্রপ্রতাপ হলেন সভাপতি, মৌলানা বরকতুল্লা হলেন প্রধানমন্ত্রী ও ওবাইদুল্লা সিন্ধি হলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই অস্থায়ী সরকার ভারতীয়দের প্রতি তিনটি ঘোষণাপত্র প্রচার করলেন—একটি মুসলমানদের জন্য, একটি হিন্দুদের জন্য এবং একটি সমস্ত ভারতীয়র জন্য।

ইতিমধ্যে মাহমুদ উল-হাসান তুরস্কে গিয়ে, ধর্মগুরুদের কাছ থেকে একটা ফতোয়া আদায় করতে সক্ষম হলেন, যাতে ভারতীয় মুসলমানদের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ডাক দেওয়া হল। বালুচিস্থান সীমান্তে বেশ খানিকটা অঞ্চল সাময়িকভাবে স্বাধীনও হল, কাবুলের অস্থায়ী সরকারের বিদ্রোহী সেনাদের সাহায্যে। সেই বিপ্লবী সৈনিকদের মধ্যে অন্তত একজন

বাঙালির নাম আমরা জানি—প্রমথনাথ দত্ত, পরে যিনি বিখ্যাত হন দাউদ আলি দত্ত নামে।

## "রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র"

ওবাইদুল্লা সারা ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দিয়ে রেশমী রুমালে সাঙ্কেতিক ভাষায় নির্দেশ লিখে, সেগুলি পাচার করতে লাগলেন তাঁর সহকর্মীদের কাছে। ওবাইদুল্লার সংযোগ ছিল সিন্ধু, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, এমনকি সুদূর বাংলাতেও। বাংলাদেশে তাঁর অনুগামী ছিলেন তরুণ জঙ্গী জাতীয়তাবাদী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আর তাঁর ছাত্র সাকরেদদের অন্যতম ছিলেন পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট নেতা আবদুর রেজ্জাক খান। কাবুল ছিল ওবাইদুল্লার কেন্দ্র, তেহরান এবং কনস্তান্তিনোপলে ছিলেন দাউদ আলি দত্ত, পাণ্ডুরং কানখোজে ও বীরেন দাসগুপ্তর মত দুঃসাহসী বিপ্লবীরা। দেওবন্দের ছাত্রদের উপর ভার ছিল লাহোরে বিদ্রোহ করার।

দুর্ভাগ্যক্রমে সাঙ্কেতিক লিপি সহ রেশমী রুমাল ইংরেজ গোয়েন্দাদের হাতে পড়ে যায়। চলে ব্যাপক খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার। সুরু হয় প্রসিদ্ধ "রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র মামলা।" বন্দী হন অধ্যক্ষ মাহমুদ-উল-হাসান, নির্বাসিত হন সুদূর মাল্টা দ্বীপে। অন্তরীন হন মৌলানা আবুল কালাম আজাদও। আপাততঃ ব্যর্থ হয়ে যায় ওবাইদুল্লা সিন্ধির সশস্ত্র গণবিদ্রোহের পরিকল্পনা।

১৯১৭-র নভেম্বরে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ী হল। লেনিনের নেতৃত্বে তরুণ সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রাচ্য জগতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সমস্ত মুক্তিসংগ্রামগুলির দিকে বাড়িয়ে দিল বন্ধুতার হাত। প্রাভদা লিখল: "প্রাচ্য জগৎ লাল হয়ে উঠছে। তার প্রমাণ পাচ্ছি আমরা আফগানিস্তান, মিশর ও ভারতে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের খবর থেকে। পূর্ব জগৎ লণ্ডনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, তাকাচ্ছে মস্কোর দিকে, হাত বাড়াচ্ছে সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে।" (প্রাভদা, ১৫ ডিসেম্বর ১৯১৮)।

## রুশ বিপ্লব ও বরকতুল্লাহ্

১৯১৯-এর মার্চ মাসে কাবুলে অবস্থিত "ভারতের অস্থায়ী সরকারের" প্রধানমন্ত্রী মৌলানা বরকতুল্লাহ্ ফারসী ভাষাতে একটি পুস্তিকা রচনা করলেন:

বলশেভিজম ও মুসলিম রাজনীতি। এই পুস্তিকা গোপনে হাজার হাজার কপি ভারতে প্রেরণ করা হল। ইংরেজ সরকার পুস্তিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। পুস্তিকাটিতে বরকতুল্লাহ্ লিখেছিলেন: "রাশিয়ার দিগন্তে বিশ্ব মানবের স্বাধীনতার সূর্য উঠেছে, সেই সূর্যের নাম লেনিন। জাতি ধর্ম শ্রেণীর ভেদাভেদ ঘুচে গেছে।" (হোম। পল। এফ. এন. ২২৯৫, ২৮ অক্টোবর, ১৯১৯)।

১৯২৯-এর মার্চ মাসে আফগানিস্তানের আমীর হবিবুল্লা নিহত হলেন এবং তাঁর জায়গায় নতুন আমীর হলেন ঘোরতর ইংরেজবিরোধী আমানুল্লা। তিনি কাবুলের ভারতীয় বিপ্লবীদের সুদৃঢ় সমর্থন জানালেন এবং সোভিয়েত-আফগান সম্পর্কও উন্নত হল। প্রাভদাতে এক সাক্ষাৎকারে বরকতুল্লাহ্ বললেন: "আমীর আমানুল্লা ঘোরতর ইংরেজবিরোধী এবং আমাদের (ভারতীয় বিপ্লবীদের) সাহায্যে করতে তিনি প্রতিশ্রুত। বলশেভিকদের আদর্শ ভারতে দ্রুত জনপ্রিয় হচ্ছে। ভারতে গণবিক্ষোভ ফেটে পড়ছে। বাংলা হচ্ছে সবচেয়ে বিপ্লবী প্রদেশ।…অপর বিপ্লবী প্রদেশ পাঞ্জাব হচ্ছে প্রায় আফগানিস্তানের সীমান্তে।" ডাঃ [অধিকারী (সম্পা) ডকুমেন্টস্ অব দি হিস্ট্রি অব দি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৯-২০]

## লেনিনের প্রত্যাভিবাদন

১৯১৯-এর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে কাবুলে ও তাসখন্দে ভারতীয় বিপ্লবী সংঘ দুটি সমাবেশ করে অভিবাদন জানাল নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রকে। উত্তরে লেনিন প্রথমে মস্কো বেতারে ভাষণ দিয়ে (১০ মে ১৯২০) ও পরে ২০ মে প্রাভদাতে ছোট্ট প্রবন্ধতে লিখলেন: "আমি জেনে আনন্দিত হলাম যে জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের ও শ্রমিক-কৃষক রাষ্ট্রের নীতি প্রগতিশীল ভারতীয়দের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে এবং তারা স্বাধীনতার জন্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাচ্ছে। রাশিয়ার মেহনতী মানুষ ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের জাগরণকে গভীর দরদের সঙ্গে লক্ষ করে যাচ্ছে।…মুসলমান এবং অমুসলমান-দের ঐক্য গড়ে ওঠায় আমরা খুসী।" (লেনিন: নির্বাচিত রচনাবলী, ৩১ খণ্ড)।

১৯১৯-এর মে মাসে মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লাহ্, প্রতিবাদী আচার্য, দলীপ সিং গিল প্রভৃতি ক্রেমলিনে গিয়ে লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন। তারপর ঐ

বছরই জুন মাসে সোভিয়েতে গিয়ে পৌঁছান পাঞ্জাবের বিপ্লবী রহমত আলি বা জ্যাকেরিয়া। তিনি ছিলেন কাবুলের "অস্থায়ী ভারত সরকারের" প্রচারমন্ত্রী। রুশ বিপ্লবের পর তিনি আকৃষ্ট হন সাম্যবাদের দিকে, নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেন।

## রহমত আলি জ্যাকেরিয়া

সোভিয়েত মধ্য এশিয়াবিশারদ গবেষক ডঃ দেবেন্দ্র কৌশিক লিখেছেন যে ১৯১৯-এর ৯ জুন তাসখন্দে, তুর্কিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেছিলেন জ্যাকেরিয়া। তাঁর বক্তৃতা শেষ হলে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দ উঠে দাঁড়িয়ে ধ্বনি দেন : ভারত দীর্ঘজীবি হোক। (লিঙ্ক, ২৬ জানুয়ারি ১৯৬৬)। ভারতের অন্য একজন খ্যাতিমান গবেষক এর উপর মন্তব্য করেছেন : "এর থেকে মনে হয় যে তিনি খুব সম্ভবত পাকা-পাকিভাবে কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছিলেন ইতিমধ্যেই। নইলে পার্টি কংগ্রেসে শুধু উপস্থিতি নয়, বক্তৃতাদান হয়তো ঐ সময়ে সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে" (চিন্মোহন সেহানবীশ : রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, পৃঃ ১০৩)।

মস্কো থেকে ১৯৬৯-এ একটি বই প্রকাশিত হয় : লেনিনন থ্রু দি আইজ অব দি ওয়ার্ল্ড। তাতে বলা হয়েছে যে জ্যাকেরিয়া ১৯২০-তেই যোগ দেন তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে। বইটিতে বলা আছে যে উর্দু ভাষাতে ভারতের চাষীদের সম্বন্ধে তাঁর অনেক লেখাও তখন প্রকাশিত হয়েছিল। এমনই একটি রচনাতে জ্যাকেরিয়া লিখছেন : "বলা চলে যে নবজাত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কমরেড লেনিনের শিক্ষার সরাসরি প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। ঐ পার্টির নেতারা প্রায়ই আলাপ-আলোচনা করতেন লেনিনের সঙ্গে। আর ঐভাবে তাঁরা রসদ যোগাড় করতেন বিপ্লবী চিন্তার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার থেকে" (লেনিনন থ্রু দি আইজ অব দি ওয়ার্ল্ড, মস্কো, পৃঃ ২৬০)।

## তাসখন্দে ঘাঁটি

লেনিনের পরামর্শেই গোড়ার যুগের এই প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ঘাঁটি গড়লেন তাসখন্দে, কাবুল হল ভারতের সঙ্গে তাঁদের যোগা-যোগের কেন্দ্র। আর তাঁদের প্রধান কাজ হল ভারতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী

বিপ্লবী মতামত প্রচার করা। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তরফ থেকে মূল দায়িত্ব দেওয়া হল, ভারতীয় বিপ্লববাদী ও কমিউনিস্ট মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উপর।

খিলাফত আন্দোলন ও দেওবন্ধ বিদ্যায়তনের বিপ্লবীদের প্রচারের প্রভাবে শত শত তরুণ মুসলমান ভারত ছেড়ে আফগানিস্তানের পথে যাত্রা করেন। তাঁদের অনেককেই পথে বন্দী করে গুলি করে হত্যা করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু একাংশ পালিয়ে যান সোভিয়েত তুর্কমেনিয়াতে, যোগ দেন বিপ্লবী লালফৌজে। তাঁদেরই একাংশ পরে হাজির হন তাসখন্দে, যোগ দেন এম এন রায়ের সাম্যবাদ প্রচারের বিদ্যালয়ে।

## রফিক আহমদের স্মৃতিচারণ

কি কঠিন পথে, কত বিপদ অতিক্রম করে এঁরা গিয়েছিলেন, বহু বছর পরে স্মৃতিচারণ করে তাঁর জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন ভূপালের রফিক আহমদ, আর তা লিপিবদ্ধ করেছেন মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর বই "প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন"-এ। তার থেকে খানিকটা তুলে দিচ্ছি। তুর্কমেন প্রতিবিপ্লবীদের হাত থেকে কোনও রকমে মুক্তি পেয়ে প্রায় ৩০ জন বিপ্লবী মুসলিম আশ্রয় নেন সোভিয়েত তুর্কমেনিয়ার কির্কি দুর্গে। রফিক আহমদ লিখছেন:

"আমরা ২০ জন এগিয়ে এসে বললাম, আমাদের হাতে হাতিয়ার দিন, আমরাও লড়াই করব। অফিসার খুসী হয়ে আমাদের রাইফেল দিয়ে বললেন: আমুদরিয়ার দিকটা আপনাদের রক্ষা করতে হবে।—শত্রুদের উপর আক্রমণে আমরা তিনজন যোগ দিয়েছিলাম—শউকৎ উসমানি, মসূউদ আলি শাহ্ ও আমি। তিনদিন আক্রমণের পর তুর্কমেন প্রতিবিপ্লবীরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়ে যায়" (মুজফ্‌ফর আহমদ: প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, ১৯৬১, পৃঃ ২৫-২৬)

কির্কি থেকে রফিক আহমদরা গেলেন তাসখন্দ অভিমুখে। তাঁর মুখেই আবার বর্ণনা শোনা যাক: "তাসখন্দ যাওয়ার উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠে বসলাম। আমাদের দলে ছিলেন মহম্মদ আকবর খান, মীর আবদুল মজিদ, সুলতান মাহমুদ, ফিরোজুদ্দিন, মনসুর, গওহর রহমান খান, মিঞা মুহম্মদ আকবর

শাহ, শউকৎ উসমানি, রফিক আহমদ প্রভৃতি।…বোখারা থেকে রওয়ানা হয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত তাসখন্দে পৌঁছাই।

## তাসখন্দে এম. এন. রায়

…আমরা পৌঁছাবার কিছুক্ষণ পরে মানবেন্দ্রনাথ রায়, তাঁর স্ত্রী এভেলিন রায়, অবনী মুখার্জি ও তাঁর রুশীয় স্ত্রী এবং মুহম্মদ সফিক আমাদের সঙ্গে দেখা করেন…পরে এম. এন. রায় আমাদের সঙ্গে সুবিস্তৃত আলোচনা করলেন। ভারতে বিপ্লব কোন পথে অগ্রসর হবে এইসব কথা তিনি আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন। এম. এন. রায়ের কথা সব না বুঝলেও অনেক কিছু বুঝলাম। তখনও আমরা কমিউনিস্ট পার্টি বুঝতাম না। স্থির করলাম এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে আমরা কাজ করব।" (প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, পৃঃ ২৫ ২৬)

মানবেন্দ্রনাথ রায় এইসব ঘটনা সম্বন্ধে কি বলছেন, তাও একটু দেখা যাক: "খিলাফৎপন্থী যে মুসলিমরা তাসখন্দে এলেন, তাঁরা ছিলেন নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ বিরোধী, কিন্তু ইংরেজদের তাড়িয়ে ভারতে কি ধরনের রাষ্ট্র গড়বেন, সে ব্যাপারে তাঁদের কোনও নির্দিষ্ট মতামত ছিল না। আমরা স্থির করলাম যে এঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তাঁরা বিপ্লবের বিশ্বস্ত সৈনিকে রূপান্তরিত হন।…ভারতীয় বিপ্লবীদের কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত করতে আমরা চাইনি, কিন্তু তাঁদের হাতে আমরা বন্দুক তুলে দিচ্ছিলাম। সেটা যাতে আমাদের বিরুদ্ধে না ব্যবহৃত হয়, তার জন্যই আমরা তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলাম।" (এম. এন. রায়: মেমোয়ার্স, কলকাতা, ১৯৬৪ পৃঃ ৪৬১-৬২)

## প্রবাসে সি পি আই গঠন (১৯২০)

সে যাই হোক, ১৯২০-র ১৭ অক্টোবর ৭ জন বিপ্লবীকে নিয়ে তাসখন্দে গঠিত হল "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" নামে একটি সংগঠন। তার সভ্য হলেন এম এন রায়, এভেলিন ট্রেন্ট রায়, অবনী মুখার্জী, রোজা ফিটিংগফ, মুহম্মদ আলি, মুহম্মদ সফিক ও এম. প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর আচার্য।

মুহম্মদ সফিক সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক ছিল কিন্তু ১৯৬৯-এ প্রসিদ্ধ ভারতীয় গবেষক চিন্মোহন সেহানবীশ মস্কোর লেনিন

লাইব্রেরিতে, সোলোগিউবভের লেখা "তুর্কিস্তানে বিদেশী কমিউনিস্ট" গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠাতে অকাট্য তথ্য পান। সেখানে লেখা আছে :

"১৯২০-র ২৭ অক্টোবর তাসখন্দে প্রতিষ্ঠা হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির। তুর্কিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে এক চিঠিতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তুর্কিস্তান ব্যুরো লেখে : সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাই যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের নীতি অনুযায়ী এখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করবে কমিন্টার্ণের তুর্কিস্তান ব্যুরোর রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীনে।...সংস্থার সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড সফিক।" (চিন্মোহন সেহানবীশ : রুশ বিপ্লব ও প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী, পৃঃ ১৬৪)

১৯২১-এ এই "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে" ক্রমে ক্রমে যোগ দেন শউকৎ উসমানি, গওহর রহমান খান, মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ, সুলতান মাহমুদ, মীর আবদুল মজিদ, ফিরোজুদ্দিন মনসুর, ফিদা আলি জাহিদ, রফিক আহমদ, হবিব আহমদ নসীম, ফজল ইলাহি কুরবান ও আবদুল্লা সফদর।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করে ভারতকে স্বাধীন করাই ছিল দেশত্যাগী বিপ্লবী মুসলিম তরুণদের ধ্যানজ্ঞান। আর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকও ১৯২০-তে তার দ্বিতীয় কংগ্রেসে সমস্ত পরাধীন ও নিপীড়িত জাতিদের সামনেও মূল কর্তব্য রেখেছিল সর্বপ্রথম বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ভেঙ্গে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা। সুতরাং বছরখানেক কমিউনিস্ট আদর্শে দীক্ষিত হয়ে, এম এন রায়ের পরামর্শ অনুযায়ী মুসলিম বিপ্লবীরা ফিরে চললেন ভারতের পথে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট—ইংরেজের বেড়াজাল এড়িয়ে ভারতে প্রবেশ করে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে পূর্ব স্বাধীনতার লড়াইকে জোরদার করা এবং ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করে, কমিউনিস্ট পার্টির শাখা গড়ে তোলা।

## মস্কো থেকে ফেরা

ভারত থেকে সোভিয়েত রাশিয়া যাবার সময়ও যেমন বহু বিপদ পেরিয়ে তাঁদের যেতে হয়েছিল, ফেরার পথেও তাই। যাবার পথের বিপদসঙ্কুল

বর্ণনা আমরা তুলে দিয়েছি রফিক আহমদের বর্ণনা থেকে। ফেরার পথের বর্ণনা দিচ্ছি আরও প্রসিদ্ধ এক বিপ্লবী মিঞা আকবর শাহর বর্ণনা থেকে। ১৯৬৭-র অক্টোবর মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের গ্রাম বাদরাশীতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল দৈনিক "সংবাদ"-এর তরফে রোকেয়া রহমান কবীর। সেই লেখাটি সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রণ করা হয়, ১৯৬৮-র ৯ নভেম্বরের "সাপ্তাহিক কালান্তর"-এ। তার থেকেই উদ্ধৃতিটি দেওয়া হল :

"আমি এবং আরও তিনজন, আমরা চারজন। মস্কো থেকে ফেরার জন্য আমাদের নেওয়া হল একটা বিশেষ ট্রেন। ইঞ্জিন আর দুটো ওয়াগন নিয়ে এই বিশেষ ট্রেন। আমরা এলাম ভলগোগ্রাডের কাছাকাছি "মনারাল ভাশ" রেল স্টেশনে। সেখান থেকে বাকু। বাকুতে গওহর রহমান খান দেখা করলেন আমাদের সঙ্গে। বাকুতে আমরা দুইদলে বিভক্ত হয়ে গেলাম। একই দলে আমি এবং গওহর রহমান খান, অন্য দলে ফিরোজ আলি মনসুর, আবদুল মজিদ ও সুলতান মোহাম্মদ খান।

## আকবর শাহ্‌র বিবরণ

বেশ নিরাপদেই আমরা জর্জিয়া অতিক্রম করলাম। কিন্তু আর্মেনিয়ায় পৌঁছেই শুরু হল বিপদ। ...আমরা আবার ফিরে এলাম বাকুতে। (তারপর বহু বিপদ পেরিয়ে) আমরা নিরাপদে ইস্পাহানে পৌঁছলাম। ইস্পাহানে রুশ দূতাবাসের অতিথি হিসাবে ছিলাম এবং সেখানে আমি অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার পেয়েছি। তারপর রওয়ানা হলাম সিরাজের উদ্দেশ্যে। যাত্রাটি ছিল খুবই সংকটপূর্ণ।

কিছুদিন পথ চলার পর আমরা দক্ষিণ পারস্যের বাসের নামক সরাইতে পৌঁছলাম। এই সরাইতেই শওকৎ উসমানির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। ...তাসখন্দে এবং মস্কোতে আমরা একইসঙ্গে ট্রেনিং নিয়েছিলাম। একসাথেই আমরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলাম। ...উসমানির আবির্ভাবে আমি আশ্বস্ত বোধ করলাম।

...(জাহাজে করে) করাচীর কাছাকাছি এসে আমি দুশ্চিন্তায় পড়লাম— কি করে আমি পোর্ট কর্তৃপক্ষকে ফাঁকি দেব? অবশেষে একটা বুদ্ধি বের

করলাম। মেলা কুলি ছিল জাহাজে। ...কুলিদের ভীড়ে মিশে গেলাম। আমাকে কেউ সন্দেহ করল না। কুলিদের সাথে নিরাপদে আমি বেরিয়ে এলাম। পরদিন আমি যখন লাহোরের ট্রেনে চড়লাম, তখন আমি নিশ্চিত যে, পুলিশের চোখকে আমি সার্থকভাবেই ধুলো দিয়েছি।...কিন্তু পেশোয়ার পৌঁছতেই আমাকে "বলশেভিক এজেন্ট" হিসাবে গ্রেপ্তার করা হল এবং গ্রেপ্তারের পরই আমি জানতে পারলাম যে...করাচীতেই পুলিশ আমাকে চিনে নিয়েছিল"।

## ইংরেজ গোয়েন্দাদের মতামত

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দা প্রবররা আকবর শাহ সম্বন্ধে ১৯২৩-এ কি লিখেছিলেন, তাও একটু দেখা যাক:

"অভিযুক্ত আসামী আকবর শাহ্ আমাদের কাছে এক ঝুড়ি মিথ্যা ভাষণ করেছে। আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে আসামী আকবর শাহ্ ও গউহর রহমান রাশিয়ার নানান শহরে গেছে ও বাকুতে এম. এন. রায়ের তারা বিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিল। রায় আকবর শাহ্কে দক্ষ বিপ্লবী প্রচারক বলে মনে করতেন। তার প্রমাণও আমাদের আছে। আকবর শাহ্ ও গউহর রহমান, এম. এন. রায়ের একান্ত প্রিয় পাত্র শউকৎ উসমানির সঙ্গেও ঘনিষ্ট-ভাবে যুক্ত ছিল।" (ফর এ্যাণ্ড পল/মিড এশিয়া/এফ. এস. ৭৬৫-এম/১৯২৩—গোপন/এন. এ. আই.)

সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দারা যে এই মস্কো-ফেরত মুসলিম বিপ্লবীদের খুবই বিপজ্জনক মনে করত, তা এই গোপন রিপোর্ট থেকেই স্পষ্ট। তাই ১৯২২-২৩এ তারা দফায় দফায় এই বিপ্লবীদের বেশীর ভাগকেই গ্রেপ্তার করে তাদের জড়িত করে "পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা"-তে যাতে, কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড হয় বেশীর ভাগেরই।

সোভিয়েত-ফেরৎ মুসলিম বিপ্লবীদের "বলশেভিক-এজেন্ট" বলে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে পেশোয়ারে সব মিলিয়ে ৫টি ষড়যন্ত্র মামলা করেছিল ইংরেজ সরকার। প্রথমটি ১৯২২-এ, দ্বিতীয়টি ১৯২৩-এর মার্চ মাসে, তৃতীয়টি ১৯২৩-এর এপ্রিল মাসে, চতুর্থটি ১৯২৪-এ এবং বেশ কিছুদিন পরে পঞ্চমটি ১৯২৭-এ।

## পাঁচটি ষড়যন্ত্র মামলা

প্রথম পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা হয় সেসনস্ আদালতের বিচারক জে এইচ আর ফ্রেজারের এজলাসে। ১৯২২এর ৩১ মে তিনি রায় দেন, আকবর কুরেশীকে তিনবছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও বাহাদুরকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে।

দ্বিতীয় পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা হয় ঐ একই বিচারকের আদালতে, ১৯২৩-এর ৭ মার্চ থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত। অনেক বেশী কঠোর দণ্ড দেন তিনি এই মামলার অভিযুক্তদের। মহম্মদ আকবরকে দেওয়া হয় ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। বালুচিস্তানের মহম্মদ হাসানকে দেওয়া হয় ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। গুলাম মেহবুবকেও দেওয়া হয় ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

প্রায় একই সময়ে, ১৯২৩-এর ৪ এপ্রিল থেকে ১৮ মে পর্যন্ত, পেশোয়ারের ম্যাজিস্ট্রেট জে আলমগের এজলাসে ৮ জন বিপ্লবীর বিচার হয়। সকলেরই কারাদণ্ড হয়। মিঞা আকবর সাহ্ ও গউহর রহমানের দুবছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বাকী ৯ জনের—মীর আবদুল মজিদ, ফিরোজুদ্দিন, হাবিব আহমদ, রফিক আহমদ ও সুলতানের একবছর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

## নিষ্ঠুর কারাদণ্ড

একবছর পরে ধরা পড়েন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট মহম্মদ সফিক। ১৯২৪-এর ৭ এপ্রিল সেসনস্ আদালতের বিচারক জি গনার তাঁকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। সউকৎ উসমানিও ধরা পড়েন ১৯২৩-এ, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে পেশোয়ারে ষড়যন্ত্র মামলা না করে, তাঁকে ও ভারতের অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতাদের জড়িয়ে শুরু হয় কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা। তার ইতিহাস স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার বিষয়।

১৯২৭-এ ধরা পড়েন ফজল এলাহি কুরবান। পেশোয়ারেই তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হয় এখানকার পঞ্চম ষড়যন্ত্র মামলা। ইতিহাসে তা মস্কো ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। তাঁকেও দেওয়া হয় ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। পরে আপীলে তা কমে হয় ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

## সাম্রাজ্যবাদীদের রায়

এই বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কি রায় আদালতের সাম্রাজ্যবাদী বিচারকরা

দিয়েছিলেন ? মহম্মদ আকবরকে দণ্ড দিতে গিয়ে বিচারক ফ্রেজার মন্তব্য করেছিলেন :

"প্রতিষ্ঠিত যে কোনও সরকার সম্বন্ধে বলশেভিকদের মনোভাব সর্বজনবিদিত। বর্তমানে পৃথিবীতে যত সভ্য সরকার আছে, তাদের সবাইকে উচ্ছেদ করতে তারা বদ্ধপরিকর। এরই ভিত্তিতে এই বলশেভিকদের শাস্তি দিতে আমার কোনও দ্বিধা নেই।"

দ্বিতীয় ষড়যন্ত্র মামলার রায় দিতে গিয়ে ঐ একই বিচারক বলছেন :

"এম এন রায় এবং বলশেভিকদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এইসব তরুণকে বিপ্লবী প্রচারে সুশিক্ষিত করে গোপনে ভারতে ফেরৎ পাঠানো, যাতে তারা ভারতে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করে। এর ফলে ভারতে সশস্ত্র গণবিদ্রোহ ঘটে গিয়ে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ হবে—এটাই তাদের আশা। ...শান্তিপূর্ণ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা রায়ের লক্ষ্য নয়। সে চায় সশস্ত্র বিপ্লব। তার লক্ষ্য ভারতের জনসাধারণকে জাগ্রত করে গণবিপ্লব সংগঠিত করে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা।"

( এ পর্যন্ত ব্যবহৃত সবকটি উদ্ধৃতি ও মামলার রায়ের তথ্য নেওয়া হয়েছে ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদিত ডকুমেন্টস অব দি হিষ্ট্রি অব দি কমিউনিস্ট পার্টি, দ্বিতীয় খণ্ডের "পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা" অধ্যায় থেকে )

## এম এন রায়ের দৃপ্ত প্রতিবাদ

পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত বিপ্লবীদের সপক্ষে ভারতের জাতীয় আন্দোলন বিশেষ সোচ্চার হয়নি, আর কমিউনিস্ট আন্দোলন তখন ভারতে নিতান্তই অঙ্কুরের স্তরে। তবে কোনও প্রতিবাদ কোথাও হয়নি, তা ঠিক নয়।

কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র "ইনপ্রেকর"-এ দৃপ্ত প্রতিবাদ জানিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। ইংরেজ সরকারকে এবং বিশেষভাবে ব্রিটিশ লেবার পার্টিকে তিনি ধারালো প্রশ্ন করেন : "এই কয়টি ব্যক্তির অপরাধ কি ? তারা সোভিয়েত রাশিয়াতে গিয়েছিল, কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছে, ভারতে ফিরে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করছিল—এই তো ? এগুলি যদি অপরাধ হয়, তবে জর্জ ল্যান্সবেরি কেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য থাকবেন, আর সউকৎ উসমানি কেন হবেন ফেরারী আসামী ? ইংলণ্ডে তো

অনেক কমিউনিস্ট আছে। একজত ভারতীয় কমিউনিস্ট হলেই তা অপরাধ হবে কেন? ইংলণ্ডে কমিউনিস্টরা আইনী প্রচার করতে পারে, কিন্তু ভারতীয় যুবকরা তা করলে তা হবে রাজদ্রোহ?

আসলে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে চায় বলেই এমন বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে নবজাত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির উপর, পেশোয়ারে চলছে নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র মামলা।...কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এই সন্ধিক্ষণে ব্রিটিশ লেবার পার্টি কি ভূমিকা নেবে?" (ইনপ্রেকর, ৩১ মে ১৯২৩)

পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা ও সোভিয়েত প্রত্যাগত তরুণ মুসলিম বিপ্লবী-দের নিগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল শক্তিসমূহের উপর তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি বটে, কিন্তু তাঁদের দুঃখবরণ একেবারে বৃথা যায় নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন, রুশ বিপ্লব ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের একটানা বিষোদ্গার, জাতীয় আন্দোলনের প্রবীণ ও নবীন অনেক কর্মীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

## দেশী সংবাদপত্রে সোভিয়েতের প্রশংসা

১৯১৯-এর সেপ্টেম্বর বারাণসী থেকে প্রকাশিত হিন্দি মাসিকপত্র "মর্যাদা"-তে লেখা হল "রুশ দেশে বলশেভিকবাদের বিজয়, পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটিয়েছে। তা পৃথিবীর সামনে একটা আদর্শ উপস্থিত করেছে, যা বলছে যে সব মানুষই সমান এবং যা ধনপতিদের কাছ থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে তা শ্রমিক ও কৃষকদের হাতে অর্পণ করেছে। তা দেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমজীবীদেরও চোখ খুলে গেছে এবং একই রাস্তা অনুসরণ করে নিজেদের মাতৃভূমিতে সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা করার কথা তারাও চিন্তা করছে।"

দুবছর পরে "রুশ বিপ্লবের দান" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলাদেশের একটি প্রগতি-শীল সাপ্তাহিক লিখছে: "প্রথমে বিপ্লবের সুফলের কথা বলতে গেলে রুশের শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে হয়। জারের রাজত্বে বারো আনা প্রজা নিরক্ষর ছিল। এখন রাশিয়ায় লেখাপড়া শিখছে আপামর জনসাধারণ। এই নতুন সার্বজনীন বিদ্যাদান বিপ্লবেরই ফল।" (বিজলী, ১৭ জুন ১৯২১)

### অনন্তানন্দের পত্র

এর এক বছর পরে অন্য একটি প্রগতিশীল বাংলা সাপ্তাহিকে বের হল

"অনন্তানন্দের পত্র।" তাতে লেখা হল: "দুঃখের চাপে পেটের জ্বালায় সাধারণ লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী, আমেরিকা সর্বত্রই তারা বর্তমান শাসন কর্তাদের ঠেলে ফেলে দিয়ে শাসনযন্ত্রটা অধিকার করবার চেষ্টা করছে। রুশিয়ার অপরাধ এই যে, সে কার্যটা তারা সকলের আগে করে ফেলেছে। তাই ইউরোপের মোড়লের দল চারিদিক থেকে চীৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। আর তাদের দেখাদেখি আমরাও সেই চীৎকারে যোগ দিয়েছি।···বলশেভিজম বলে এটাকে উড়িয়ে দিলে এটার উপর অবিচার করা হবে। এটা খাঁটি এদেশের আদর্শ। তোমরা ইংরেজের পুঁথি পড়ে যে স্বরাজের আদর্শ আমদানী করেছো, সেটা ইউরোপের পচা ডিমোক্রাসী। ইউরোপের অঙ্গ থেকেই তা খসে পড়তে আরম্ভ করেছে।" (আত্মশক্তি, ২২ নভেম্বর, ১৯২২)

"অনন্তানন্দ" নামের অন্তরালে এই চিঠিটা তখন লিখেছিলেন প্রসিদ্ধ বিপ্লববাদী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## রবীন্দ্রনাথের পর

রবীন্দ্রনাথ তখনও রাশিয়ায় যান নি, এ বিষয়ে তাঁর ধারণা তখন যথেষ্ট অস্পষ্ট। তথাপি ১৯২৩-এ তিনি লিখলেন:

"দাসের দল ভেবেছিল যারা তাদের চালাচ্ছিল তারাই চালাক, অতএব কাঁধ পেতে দিতেই হবে। ইদানীং তারা এই সহজ কথাটা আবিষ্কার করেছে যে তারা না চালালে উপরওয়ালারা অচল। তারা অত্যাবশ্যক—অতএব বর্তমান ঐশ্বর্য্য তাদেরই হাতে, এই আবিষ্কারের জোরে বর্তমান সভ্যতার বাহনের দল মাঝে মাঝে কাঁধঝাড়া দিতে আরম্ভ করেছে। আর উপরে যারা বসে আছে, তারা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠছে।" (সংহতি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০)

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদও এসব লেখা পত্র দেখে গভীর উদ্বেগ বোধ করছে, লিখছে: "সাধারণভাবে বলতে গেলে রুশ বিপ্লবের সপক্ষে ভারতে প্রচার হু হু করে বাড়ছে।" (লণ্ডনে ভারত সচিবের কাছে ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিবের গোপন রিপোর্ট, হোম পল এফ. এন: ১০৪|৪ ১৭ মে, ১৯২৩)

## সাম্রাজ্যবাদী বিচারকের মন্তব্য

১৯২৩ এর পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের রায় দিতে গিয়ে সেসনস্ জজ ফ্রেজার বলছেন:

"আমার মনে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে মিঞা আকবর শাহ ও অন্যান্য অভিযুক্তরা সবাই কমিউনিস্ট এবং তারা গোপনে ভারতে ফিরছিল, এম এন রায়ের নির্দেশে ভারতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে, সশস্ত্র গণবিপ্লব সংগঠিত করার জন্য। বিশেষ করে মিঞা আকবর শাহ ও গউহার রহমান ছিলেন এম এন রায়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র সউকৎ উসমানির প্রগাঢ় বন্ধু। তাঁরা সুনিশ্চিতভাবেই ভারতে এসেছেন, এদেশে রুশ বিপ্লবের ও বলশেভিকদের আদর্শ প্রচার করতে। তাই তাদের কঠোর কারাদণ্ড দিতেই হবে, যাতে ভারতের উত্তপ্ত মাটিতে কিছুতেই বলশেভিজমের বীজ বপন করা না যায়।"
(হোম | ফরেন | এফ এন ৭৬৫—এম / ১৯২৩—গোপনীয়)

## কমিউনিজম অপ্রতিরোধ্য

কিন্তু ফ্রেজার, সেসিলকে বা অন্যান্য কমিউনিস্ট-বিরোধী ইংরেজ প্রশাসকদের আশা পূর্ণ হয় নি। কমিউনিস্ট আদর্শের প্রচারকে তারা ভারতে নির্মূল করতে পারে নি। পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা যখন চলছে, ঠিক তখনই কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কানপুর ও লাহোরে একদল তরুণ জোটবদ্ধ হচ্ছিলেন রুশ বিপ্লবের আদর্শকেই ধ্রুবতারা করে, ভিত্তি রচনা করছিলেন সবকটি গোষ্ঠীকে একত্র করে, ভারতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার।

পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলায় কমিউনিজমকে ধ্বংস করা গেল না দেখে, ১৯২৩-এর শেষে সাম্রাজ্যবাদ আর এক দফা আক্রমণ করল, কলকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজের নেতাদের গ্রেপ্তার করে। শুরু করল কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা। সে এক স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

# কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা

১৯২১-এর সূচনাতে ভারতে কমিউনিস্ট-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান সেসিলকে বড়লাটের কাছে পাঠানো তাঁর গোপন রিপোর্টে লিখলেন :

"জমি বিতরণের প্রশ্নে বলশেভিকদের কর্মপদ্ধতি ভারতীয় জনতার কাছে খুবই আদর পাবে এবং ভারতীয় আন্দোলনকারীদের মধ্যে যারা নিজেদের বলশেভিক বলছে, তারা এই কাজটিই করছে।...ভারতবর্ষে বিপ্লব নিশ্চয় লেনিনের কাম্য, তবে আমার মনে হয় যে লেনিন চান যে ভারতে বিক্ষোভ তার নিজস্ব ভঙ্গিতেই এগিয়ে চলুক।" (ভারত বলশেভিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে গোপন রিপোর্ট : সেসিলকে জানুয়ারি ১৯২১, হোম পল এফ এন ৪৫-৪৬, পৃ ১-৩)

## লেনিনের মশালের আলোতে

১৯২১-এর আগস্ট মাসে কলকাতা থেকে, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী কর্মী ফণীভূষণ ঘোষ "লেনিন" নামে একটি চটি বই লেখেন। তাতে ফণীভূষণ লিখছেন :

"মোটের উপর লেখা যাইতেছে গান্ধী ও লেনিন, উভয়েরই লক্ষ্য এক : সমাজ হইতে সর্বপ্রকারের দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধন, বিশেষত : দরিদ্রের দারিদ্র্যমোচন ও যথেচ্ছাচারী প্রভুত্বের মূলোচ্ছেদ।" (ফণীভূষণ ঘোষ, লেনিন, কলিকাতা, ১০ ভাদ্র, ১৩২৮, পৃঃ ৩৪-৩৫)

ফণীভূষণ আরও লিখেছেন : "বলশেভিকরা জগতের দারিদ্রদের দুঃখের সর্ববিধ কারণ অনুসন্ধান করিয়া তিনটি মূল কারণে উপনীত হইয়াছেন : (ক) অতিরিক্ত ধনলিপ্সা, (খ) মূলধনওয়ালাদের অতিরিক্ত লাভ ও (গ) অর্থগত সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ।" (ঐ, পৃঃ ২৭)

সন্দেহ নেই এ লেখাতে অনেক অস্পষ্টতা আছে, তথাপি লেনিন ও বলশেভিকদের বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি অনুরাগ, এ লেখার মধ্যে সুস্পষ্ট। আর তাই দেখেই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হয়েছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষ।

## ভারত ও রাশিয়া

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী একটি বাংলা সাপ্তাহিকে ১৯২২-এর গোড়াতে লেখা হল :

"রুশিয়ার অবস্থার সঙ্গে ভারতের অবস্থা অনেকটা সাদৃশ্য দেখিয়া প্রথমেই বলশেভিকদের কথা মনে আসে। রুশিয়ার মত কৃষিপ্রধান দেশ। রুশিয়ার শিক্ষিত লোকের সংখ্যা যেমন, ভারতবর্ষেও প্রায় তেমনই। উভয় দেশেই জাতীয় আন্দোলন পর্যায়ক্রমে সমাজসেবা ও বিপ্লববাদরূপে দেখা দিয়াছে। রুশিয়ায় বিপ্লবের কাজ বাধা পাইলেই সমাজসেবার রূপ ধরিয়া শক্তিসংগ্রহ করিয়াছে। আর পরিশেষে বলশেভিকে আসিয়া পরিণত হইয়াছে। রুশিয়ায় যে যে কারণে বলশেভিকবাদ প্রচার হইয়াছিল, ভারতবর্ষেও তাহার অনেকগুলি কারণ বর্তমান। যাহারা সমাজের ভিত্তির পাথরে চাপা পড়িয়া আছে, তাহারা সৌধবাসীদের কাছে আপনার স্বত্ব স্বার্থ বুঝিয়া পাইতে চায়। তাহাদিগকে আর দাবাইয়া রাখা চলিবে না।" (আত্মশক্তি, ১২ এপ্রিল ১৯২২)

১৯২২-এর ডিসেম্বরে গয়াতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হল। তার এক সপ্তাহ আগে লেখা হল "রুশিয়ায় বলশেভিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে দেশে আজ একটি প্রবল আন্দোলন পড়িয়া গিয়াছে : 'ধ্বংস কর ঐ মূলধনওয়ালাদের, ধ্বংস কর ঐ জমিদারদের'। তাহার বদলে যাহারা খাটিয়া খাইতেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যাহারা পরিশ্রম করিতেছে, তাহাদিগকে সমস্ত সুখ সুবিধা দাও। এই আন্দোলনের সুর আজ আমাদের এই মরা দেশেও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার রুদ্রবীণা আজ দিকে দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে।" (আত্মশক্তি, ২০ ডিসেম্বর, ১৯২২)

## ভূপেন্দ্রনাথের মতামত

এর কিছুদিন আগে, প্রগতিশীল অন্য একটি সাপ্তাহিকে প্রখ্যাত প্রবাসী বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর বার্লিন থেকে প্রেরিত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ছাপা হয়। তার শিরোনাম ছিল : আমাদের লক্ষ্য কি ?। তাতে ভূপেন্দ্রনাথ এই বলে শেষ করেন যে,

"ভারতের কোটি কোটি লোকের কথা ভাবিয়া চলিতে হইবে। গণবৃন্দের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিই আমাদের আদর্শ হইবে। তবেই তাহারা

আমাদের সম্পদ ও সহায় হইবে। দেশের মুক্তিকামীদের এখন কার্ল মার্কস ম্যাস্ মুভমেন্টের চর্চা করিতে হইবে।" ( শঙ্খ ৩০ অক্টোবর ১৯২২ )

প্রগতিশীল জাতিয়তাবাদী শক্তিদের মনে এসব চিন্তার যথেষ্ট ছাপ পড়ল। গয়া কংগ্রেসের পূর্বাহ্নে "একমাত্র উপায়" নাম দিয়ে লেখা হল: "চাষের জমির উপর চাষীদের স্বত্ব যদি স্বরাজের অঙ্গীভূত হয়, তাহলে চাষীরা সবাই স্বরাজ পাবার জন্য লড়তে রাজি হবে। যাঁরা কাউন্সিলে গিয়ে লড়াই করতে চান, তাঁরা এই চাষীদের হয়ে লড়তে রাজি আছেন? তাঁরা একথা বলতে রাজি আছেন যে চাষের জমি চাষীদের সম্পত্তি বলে স্থির করা হোক? জমিদার শুধু উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তারা জমির কেউ নয়। তা বলতে যদি রাজি থাকেন, তবে সমস্ত প্রজা তাদের পক্ষে এসে দাঁড়াবে।" ( আত্মশক্তি, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯২২ )

এর দু সপ্তাহ পরে আরও ধারালো ভাষাতে লেখা হল যে কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা চান যে "দেশের জনসাধারণ খাড়া হয়ে লড়ে দেশকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করে স্বদেশী পাণ্ডাদের হাতে তুলে দিক। ওহে, তা হবে না, তা হবে না। কংগ্রেসের নলচে, খোল দুইই বদলাতে হবে। তা যদি না কর, দেশকে স্বাধীন করা কংগ্রেসের কর্ম নয়।" ( আত্মশক্তি, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯২২ )

## গয়া কংগ্রেসে সিঙ্গারাভেলু

১৯২২-এর ডিসেম্বরে গয়াতে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনেই সর্বপ্রথম একজন প্রতিনিধি, মাদ্রাজের শ্রমিক নেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে তিনি একজন কমিউনিস্ট, তাঁদের আশু লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা ও তারপর দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস লাহোরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতির অভিভাষণে এই সময়ই ঘোষণা করলেন: যে স্বরাজের জন্য আমরা লড়ছি তা হবে শতকরা ৯৮ জনের জন্য স্বরাজ। লেনিনের পরামর্শে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে একটি তারবার্তা পাঠালেন গয়া কংগ্রেসের অধিবেশনে।

স্বাভাবিকভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা আতঙ্কিত হল, লিখল "অসহযোগ আন্দোলন ভেঙে যাবার পর জাতীয়তাবাদীদের চরমপন্থী অংশ, বিশেষত চিত্তরঞ্জন দাসসহ ভূতপূর্ব বাঙ্গালী রাজবন্দীরা এবং অমৃতবাজার পত্রিকার মত কোনও সংবাদপত্র, বিকল্প পথের সন্ধানে, স্পষ্টতই বলশেভিকদের গণ-জাগরণের নীতির দিকে ঝুঁকেছে।" (লণ্ডনে ভারত সচিবের কাছে ভারতের বড়লাটের গোপন তার নং ১০১৫, ২১ ডিসেম্বর, ১৯২২)

আরও ২ মাস পরে আর একটি গোপন তারে বড়লাট খবর পাঠালেন :

"এ বিষয়ে আমাদের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে আবার আন্দোলন শুরু হলে, অসহযোগ আন্দোলনকারীদের একাংশ, কমিউনিস্টরা এবং প্রাক্তন বাঙ্গালী বিপ্লববাদীরা একত্রে গোপনে বিপ্লবের পথ গ্রহণ করবেন।" (হোম|পল|এফ এম পি ১৬০, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩)

সাম্রাজ্যবাদের মনস্থির হয়ে গেল। মূল শত্রু কমিউনিস্টদের গোকুলে বাড়তে দেওয়া চলবে না, অঙ্কুরেই তাদের বিনষ্ট করতে হবে।

১৯২৩-এর ২ জুন, ভারতের বড়লাটের প্রধান সচিব জে ক্রোরার, বড়লাটের সঙ্গে পরামর্শ করে ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য একটি গোপন বিবৃতি পেশ করে তাতে লিখলেন :

"বর্তমানে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিপদ সম্বন্ধে সকলেরই অবহিত হওয়া দরকার। শুধু যে কমিউনিস্টরাই বিপজ্জনক, তা নয়। তাদের যোগাযোগ রয়েছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অন্যান্য বিপ্লবী শক্তিদের সঙ্গে। একদিকে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বাংলাদেশের যাবতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে, যারা অনেকেই এম এন রায়ের পুরানো বন্ধু। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পর তারা অনেকেই আবার ঝুঁকছে বিপ্লববাদের দিকে। তাছাড়া কয়েকদিন আগে মাদ্রাজে, এক বক্তৃতায়, চিত্তরঞ্জন দাসও বলেছেন যে তিনি শ্রমিকদের সংগঠিত করবেন। এদের উভয়ের মধ্যে সেতুর ভূমিকা পালন করছে এম এন রায় ও তার কমিউনিস্ট সাঙ্গপাঙ্গ। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রকাশ্যেই বৃটিশ বিরোধী। সুতরাং রায় ও কমিউনিস্টদের শায়েস্তা করার মত উপযোগী ব্যবস্থা এখনই অবলম্বন করা উচিত।" (গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদিত ডকুমেন্টস অব দি হিস্ট্রি অব কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২১৭)

## কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করার পরামর্শ

একই বিবৃতিতে পরামর্শ দেওয়া ছিল যে অবিলম্বে শউকৎ উসমানি, মুজফ্‌ফার আহমদ, গোলাম হুসেন, এস এ ডাঙ্গে ও সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করা হোক। অবশ্য সরকারি গোয়েন্দা দপ্তর তার আগেই কাজ সেরে রেখেছিল—সউকৎ উসমানিকে ৮ মে ও মুজফ্‌ফর আহমদকে ১৯ মে গ্রেপ্তার করেছিল। ডাঙ্গেকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৯২৪-এর ৬ মার্চ। ঐ দিনই পারোয়ানা জারী হয় সিঙ্গারাভেলুকে গ্রেপ্তার করার জন্য।

ভারতের বাইরে থেকে আসা এম এন রায়ের দূত নলিনী গুপ্তকে ও গ্রেপ্তার করা হল। তারপর ১৯২৪-এর ১৬ মার্চ শুরু হল কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা। সাম্রাজ্যবাদী উকিল সূচনাতেই বল্লেন :

"কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বলে একটি বিপ্লবী সংগঠন আছে ইউরোপে। ভারতে তার শাখা প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উপর। সেই উদ্দেশ্যে রায় মুজফ্‌ফর আহমদ, ডাঙ্গে, নলিনী গুপ্ত ও সউকৎ উসমানির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ করে চলেছেন। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদ করার। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা একদিকে একটি শ্রমিক ও কৃষক দল গড়তে চায়, অন্যদিকে দখল করতে চায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকেও।" (হোম।পল।এফ এন কে ডাবলিউ ২৬১, ১৯২৪।)

সাম্রাজ্যবাদী এই বক্তব্যের সত্যতা কতটুকু? এস এ ডাঙ্গেকে এক চিঠিতে এম এন রায় লিখছেন : "আমাদের আইনী ও বে-আইনী উভয় কায়দাতেই কাজ করতে হবে। কংগ্রেসের অংশ হিসাবেই একটি জাতীয় গণ-বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে হবে, কিন্তু সে দলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে আমাদের, কমিউনিস্ট পার্টির হাতেই। কমিউনিস্ট পার্টি অবশ্যই থাকবে আত্মগোপন করে" (ডাঙ্গের কাছে রায়ের চিঠি, ২ নভেম্বর ১৯২২, কানপুর মামলাতে প্রদর্শিত ১ নং দলিল।)

## ডাঙ্গে ও মুজফ্‌ফরের কাছে রায়ের চিঠি

১৯২৩-এর ফেব্রুয়ারিতে মুজফ্‌ফর আহমেদকে এক চিঠিতেও রায় লেখেন : "এখন আমাদের সব কাজকর্ম গোপনেই করতে হবে। কিন্তু পাশাপাশি একটি প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলও গড়তে হবে, নেতৃত্ব থাকবে আমাদের।

কমিউনিস্টদেরই হাতে, কিন্তু যার এই মুহূর্তের কাজ হবে না সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করা। এই পার্টির নাম হবে ওয়ার্কাস অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি। এই দলটি গড়াই এখনকার সবচেয়ে জরুরী কাজ।" (কানপুর মামলার ৩৫নং প্রদর্শনী)।

১৯২৩-এর ৫ জুন এম এন রায় কমিন্টার্নের তরফে খসড়া দলিল রচনা করে ভারতে পাঠান, তার নাম "ভারতের ওয়ার্কার্স ও পেজেন্টস পার্টির প্রথম সম্মেলনের প্রতি কিছু বক্তব্য।" তাতে লেখা হয় "একথা বলা হাস্যকর যে আমরা অহিংস বিপ্লবী। এমন কি ভারতের মাটিতেও অহিংস বিপ্লব বড় হতে পারে না। প্রচণ্ড সংগ্রাম না করে শোষকশ্রেণী কখনও ক্ষমতা ছেড়ে দেবে না, ইংরেজরাও আপনা থেকে ভারত ছেড়ে যাবে না। তবে আচমকা হঠকারী হিংসাত্মক কাজ করাও আমাদের ঠিক হবে না।" (কানপুর মামলা, ২নং প্রদর্শনী)।

## মাদ্রাজে লেবার কিষাণ দল গঠন

১৯২৩-এর মে মাসেই মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলু লেবার কিষাণ পার্টি অব হিন্দুস্থান নাম দিয়ে একটি দল গঠন করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এস এ ডাঙ্গে ঘোষণা করেন যে তিনিও ঐ দলের সমর্থক (সোস্যালিস্ট, বোম্বাই মে-জুন ১৯২৩)। তবে এই দল ছিল প্রকাশ্য, তার ম্যানিফেস্টো আইনীভাবে ছাপা হয় এবং তাতে বলা হয় যে এই দলের আশু লক্ষ্য ভারতের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা এবং চরম লক্ষ্য ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। [অধিকারী (সম্পা): ডকুমেন্টস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৮৫] সুতরাং এর থেকে মোটেই প্রমাণিত হয় নি যে ভারতের কমিউনিস্টরা একটা গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বদ্ধপরিকর ছিল, যে করেই হোক অঙ্কুরেই ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ধ্বংস করবে। তাই তারা এগিয়ে গেল কানপুর ষড়যন্ত্র মামলাতে, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে "গুরুতর" অভিযোগ "প্রমাণ" করতে।

১৯২৪-এর ২২ এপ্রিল কানপুরে বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হল। বিচারক হলেন সেই কুখ্যাত এই. ই. হোম যিনি ১৯২৩-এ চৌরি চৌরা মামলায় ১৭২ জন কৃষক বিক্ষোভকারীর ফাঁসীর হুকুম দিয়েছিলেন। বন্দী কমিউনিস্টরা দাবী করলেন যে তাঁদের মামলা কানপুর থেকে সরিয়ে

বোম্বাই বা কলকাতায় চালানো হোক, কারণ অভিযুক্তরা বেশীর ভাগ কলকাতা বা বোম্বাই-এর লোক ও দ্বিতীয়ত: ঐ দুই সহরে বিচার হলে জুরি-প্রথা থাকবে। কানপুরে ইংরেজ বিচারকই সর্বেসর্বা।

## বিচারের প্রহসন

বিচারপতি হোম এই আবেদনকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। মাত্র চার সপ্তাহ এই বিচারের প্রহসন চলল এবং ১৯২৪ এর ২০ মে হোম তাঁর রায় দিলেন: চারজন অভিযুক্ত কমিউনিস্ট অর্থাৎ শউকৎ উসমানি, মুজফফর আহমদ, নলিনী গুপ্ত এবং এস. এ. ডাঙ্গে—প্রত্যেকেরই চারবছর করে সশ্রম কারাদণ্ড।

১৯২৪ এর ১৯ জুন গোয়েন্দা প্রধান সেসিলকে, লণ্ডনে সহকারী ভারত-সচিবের কাছে রায়ের একটি কপি পাঠিয়ে মন্তব্য করলেন: "কমিউনিস্টদের চারজন পাণ্ডাকে কঠোর কারাদণ্ড দিয়ে ষড়যন্ত্র মামলাতে আমাদের কাজ হাসিল হয়েছে।" (হোম পল এফ এন ২৬১ কে ডাব্লু, ১৯২৪)

## সিঙ্গারাভেলুর সম্বন্ধে অপপ্রচার

সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার সমগ্র ১৯২৪-এ গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। তাই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী কর্তারা প্রথমে তাঁকে জামিনে মুক্তি দেয় ও পরে তাঁর বিরুদ্ধে আর মামলা চালায় নি। কিন্তু সিঙ্গারাভেলু কোনও সময়ই সরকারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন নি বা কোনও রকম নতি স্বীকার করেন নি। দুঃখের কথা এই যে কোনও কোনও কমিউনিস্ট নেতা, প্রমাণের অপেক্ষা না করেই, এই কুৎসা রটনা করেছিলেন যে সিঙ্গারভেলু সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন। (মুজফ্ফর আহমদ, আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ইংরেজি সংস্করণ, পৃঃ ৪০৮)

ঐসময়ই সিঙ্গারাভেলু একটি এই সমস্ত অপপ্রচারের জবাবে ছোট, দ্ব্যর্থহীন বিবৃতি দেন। তাতে তিনি বলেন:

"সরকারের কাছে আমি মুচলেকা দিই নি বা ক্ষমাও চাই নি। আমি শুধু বড়লাটের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম যে আমার বিরুদ্ধে মামলাটি কানপুর থেকে সরিয়ে মাদ্রাজে আনা হোক। সরকার তার জবাব দেন নি, তবে পরে তাঁরা আমার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।" (দি বেঙ্গলি, কলকাতা, ৩ জুলাই ১৯২৪)

তার আগেই, ১৯২৪-এর ২৭ জুন। সিঙ্গারাভেলুর পক্ষ-সমর্থনকারী উকিল মনিলাল ডক্টরের কাছে সরকার এক চিঠিতে জানান : "ভারত সরকার কানপুর ষড়যন্ত্র মামলাতে সিঙ্গারভেলুর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করেছে।" (হোম/পল এফ এন ২৬১ কে ডাব্লু, ১৯২৪)

## কানপুর বন্দীদের সপক্ষে ইংরেজ বামপন্থীরা

পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলাতে ভারতে বা পৃথিবীতে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা কিন্তু ইংলণ্ডে বামপন্থী শ্রমিক মহলে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ১৯২৪-এর মার্চ থেকে মে মাস, ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির সাপ্তাহিক মুখপত্র "ওয়ার্কার্স উইকলি"তে নিয়মিতভাবে ও ফলাও করে কানপুর মামলার শুনানীর, জবানবন্দীর ও রায়ের খবর ছাপা হয়।

রায় বেরনর পর ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র এক ধারালো সম্পাদকীয় লিখে প্রশ্ন করল : "ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের জোরেই সাধারণ নির্বাচনে জিতে, ক্ষমতার গদিতে বসেছে শ্রমিক সরকার। তাহলে তারা কেন মুখ বুজে মেনে নিচ্ছে ভারতে শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিস্টের উপর এই দমন পীড়নকে?" (ওয়ার্কাস উইকলি, লণ্ডন, ৬ জুন, ১৯২৪)।

শ্রমিকদলের মধ্যেও বামপন্থীরা এগিয়ে এলেন কানপুর বন্দীদের সপক্ষে। তাঁদের সাহায্য করার জন্য বিলাতে একটি কমিটি গড়া হল। কমিটির সদস্যদের মধ্যে রাইলেন জে ল্যান্সবেরি, জেমস ম্যাক্সটন, এ এ ম্যাকস্যানাস ও শাপুরজি সাকলাৎওয়ালা। সৌভ্রাত্রের চিহ্নস্বরূপ, ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টিও এই সংগ্রামী তহবিলে ৫০০ ফ্রাঁ দান করেন।

## শ্রমিক সরকারের লজ্জাকর ভূমিকা

তবে শ্রমিকদলের সরকার যারা তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তারা রক্ষণশীলদের মতই সমান সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব দেখিয়ে কানপুর মামলা চালিয়েছিল। ১৯২৪ এর ৯ মে ব্রিটেনের শ্রমিক সরকারের জনৈক মুখপাত্র, বামপন্থীদের, সমালোচনার জবাবে পার্লামেন্টে বলেন : "কানপুরের অভিযুক্ত বন্দীরা যে শুধু কমিউনিস্ট, তাই নয়। তারা সশস্ত্র গণবিপ্লবের

মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। সেই ষড়যন্ত্র সফল করার জন্যই তারা গঠন করেছে শ্রমিক ও কৃষক দল।" (হোম/পল এফ/এন/২৬১কে, ডাব্লু, ১৯২৪, পৃঃ ১৩৬)

শুধু তাই নয়। ১৯২৪-এর ৬ মার্চ "লেবার মান্থলি"র সম্পাদক রজনী পাম দত্ত, এম এন রায়কে এক চিঠিতে লেখেন "আমার মনে হয় আপনি ইংলণ্ডে এলে আমরা ভাল করে সমস্যার আলোচনা করতে পারব।"

এই চিঠিটি ইংরেজ গোয়েন্দাদের হাতে পড়ে। ২ মার্চ ১৯২৪, সহকারী ভারত সচিব লেখেন: "এম এন রায় ইংলণ্ডে এলে তাকে গ্রেপ্তার করতে হবে।" ভারত সরকার জবাব দেন যে তাঁরা রায়ের গ্রেপ্তারের জন্য কানপুরে পরোয়ানা জারী করছেন এবং ইংলণ্ডের পুলিশ প্রখর নজর রাখুক, যাতে রায় ইংলণ্ডে গেলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করে ভারতে পাঠানো হয়। (হোম/পল: এফ এন ১৭৬, ১৯২৪)। অর্থাৎ ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে শ্রমিক সরকারও সমান উৎসাহী ছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায় ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যদের এত প্রবল আক্রোশের কারণও ছিল। বার্লিন থেকে নানান পত্রপত্রিকা মারফৎ রায় অবিরাম সাম্রাজ্যবাদের মুখোস খুলে ধারালো আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সরকারের শত কড়াকড়ি সত্ত্বেও ভারতেও সে সব লেখা এসে পৌঁছত এবং শুধু কমিউনিস্টরা নয়, জাতীয়তাবাদী পত্রিকার সম্পাদকরাও তা সানন্দে ছেপে দিতেন।

## ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

১৯২৪-এর ২১ মার্চ এম. এন. রায় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফে, ব্রিটেনে শ্রমিক-দল গঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে ও ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণীকে এক খোলা চিঠি লেখেন। তার উপরে লেখা ছিল ভারতের শ্রমিক ও কৃষকদের তরফে এই চিঠি লেখা হচ্ছে। খোলা চিঠিতে বলা ছিল:

"মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও প্রিয় শ্রমিক কমরেডরা, ভারতবর্ষে এখন একটি মামলা হচ্ছে (কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা: গো. চ.), যার ফলাফলের উপর নির্ভর করছে ভারতের ৩০ কোটি শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও

রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামের ভবিষ্যৎ। ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ও শ্রমজীবী মানুষদের সংঘবদ্ধ করে, আমরা তাদের একটি নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়তে চাইছি, এই অভিযোগে আমার ও আরও ৭ জনের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হয়েছে। অর্থাৎ আসলে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকেই, সমস্ত শ্রমজীবী মানুষকেই। শ্রমিকদলের মন্ত্রীমহোদয় এবং প্রিয় শ্রমিক বন্ধুরা, মনে রাখবেন যে একশত বছর আগে আপনাদের পূর্বসূরী চার্টিস্ট আন্দোলনের নেতাদের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ এনেছিল ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদীরা। আজ আপনাদের মুখে কি প্রতিধ্বনিত হবে, ভারতীয় ভাইদের বিরুদ্ধে সেই সাম্রাজ্যবাদী অভিযোগ?" (ইনপ্রেকর, ২৭ মার্চ ১৯২৪)

## মামলার আসল উদ্দেশ্য কি?

দুই সপ্তাহ পরে আর একটি ধারালো প্রবন্ধ লিখলেন মার্কিন কমিউনিস্ট ও অকৃত্রিম ভারতবন্ধু, এম এন রায়ের পত্নী এভেলিন রায়। শ্রমিক সরকারকে তিনি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলেন: "কানপুরে হঠাৎ যে মামলা শুরু হয়েছে, তার আসল উদ্দেশ্য কি?···উত্তর খুবই সহজ। ভারতের বাস্তব দুর্গতির ফলে সে দেশের জনসাধারণের যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ফেটে পড়ছে, তাকে চূর্ণ করাই এই মামলার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়তঃ রুশ বিপ্লব থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে, ভারতে তার মূল শিক্ষা প্রয়োগ করে, যারাই জাতীয় মুক্তি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে চাইছে, তাদের সন্ত্রস্ত করে তোলার উদ্দেশ্যেও এই মামলা চালানো হচ্ছে।··· এ ধরনের কৌশল সাম্রাজ্যবাদ আগেও প্রয়োগ করেছে, কিন্তু তাদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। রুশ বিপ্লবের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রাম। তবে তার অগ্রগতিকে অনিবার্য করে তুলছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই। ভারতের শ্রমজীবী জনগণের পরাধীনতা ও শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার এই প্রয়াসকে কি রক্তের স্রোতে ডুবিয়ে দিতে দেবেন ইংলণ্ডের শ্রমিক সরকার? আর তা চুপ করে মেনে নেবেন ব্রিটেনের শ্রমিক-শ্রেণী?" (ইনপ্রেকর: ১৭ এপ্রিল, ১৯২৪)

কানপুর মামলায় অভিযুক্তদের ৪ বছরের কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড সম্বলিত

রায় ঘোষণার খবর পেয়ে, ম্যাকডোনাল্ড সরকারকে ধিক্কার দিয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায় একটি তীব্র প্রবন্ধতে লেখেন :

"এই অপকীর্তির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ম্যাকডোনাল্ড ও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নতুন নীতি হচ্ছে ভারতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে একটা রফা করা। এই নীতিরই অনিবার্য অঙ্গ হচ্ছে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করা। এই নোংরা কাজটি করার ভার পড়েছে শ্রীযুক্ত ম্যাকডোনাল্ডের উপর। তাই তিনি ভারতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন আর অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে চূর্ণ করতে চাইছেন ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে।" (ইনপ্রেকর : ৫ জুন, ১৯২৪)

## জাতীয়তাবাদীদের নীরবতা

একমাস পরে, সমগ্র জাতীয়তাবাদী শিবিরকে তীব্র সমালোচনা করে এম এন রায় আবার লিখলেন : "কানপুর মামলার সময় ভারতের জাতীয় আন্দোলন নীরব রইল কেন? কিছুদিন আগে যখন বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার ফাঁসী হল, তখনও একই নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়েছিলেন জাতীয় নেতৃত্ব। ...এখন কানপুরের শাস্তিপ্রাপ্ত চারজন বন্দীদের ক্ষেত্রেই একই ঘটনা ঘটল। তাই ভারতের শ্রমিকশ্রেণীকেই ঘোষণা করতে হবে : যে অবিচার ঘটেছে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আমরা চালিয়ে যাব।" (ভ্যানগার্ড : ১৫ জুলাই ১৯২৪)

সাম্রাজ্যবাদী দমননীতি কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর মনোবল ভাঙতে পারল না, দমাতে পারল না ভারতের শিশু কমিউনিস্ট আন্দোলনকে। ১৯২৪-এর এপ্রিল মাসে কানপুর শহরে এক শ্রমিক ধর্মঘট হল। দেড়মাস ধর্মঘট চলার পর, পুলিস নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে ধর্মঘট ভেঙে দিল। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন : গুলি চালানো ঠিকই হয়েছিল। (পাইওনিয়ার লক্ষ্ণৌ, ২৫ এপ্রিল ১৯২৪)। এই ধর্মঘটের অন্যতম নেতা ছিলেন সত্যভক্ত বলে এক ব্যক্তি।

## সত্যভক্তর আবির্ভাব

১৯২৪-এর জুলাই মাসে বারাণসীর "দৈনিক আজ" পত্রিকাতে এক দীর্ঘ খোলা চিঠি লিখে সত্যভক্ত ঘোষণা করেন যে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের

জন্য তিনি কানপুরে এক কমিউনিস্ট সম্মেলন ডাকছেন। তিনি লেখেন: "রাশিয়াতে কমিউনিস্ট বিপ্লব বিজয়ী হয়েছে এবং পৃথিবীর দুঃখী ও দুর্গত মানুষদের মুক্তি ও উন্নতি সম্ভব একমাত্র কমিউনিজমেরই মারফৎ।" (গঙ্গাধর অধিকারী: সম্পা: ডকুমেন্টস অব দি হিস্ট্রি অব কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৫৯৬-৯৭)। এই খোলা চিঠিতে তিনি আরও লিখলেন: সমস্ত শ্রমিক, কৃষক, ডাক-তার কর্মচারী, কেরানী ও স্কুল শিক্ষকরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিন। তলায় নিজের নাম সই করলেন ও লিখলেন ভারতীয় সাম্যবাদীদল। (ডকুমেন্টস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৯৭)

১৯২৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজি ও হিন্দি দুই ভাষাতে সত্যভক্ত একটি ইস্তাহার বিলি করলেন: ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বক্তব্য।

ইংরেজি ইস্তাহারে লেখা হল: "এই পার্টির লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করে সমস্ত উৎপাদনের বিতরণের ব্যবস্থাকে সামাজিক, যৌথভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যাতে সমগ্র সমাজেরই কল্যাণ হয়।...ভারতীয় চাষীদের সমস্ত দুর্গতির মূলে রয়েছে জমিদারি ব্যবস্থা। তাই জমিদারি প্রথাকে উচ্ছেদ করে চাষীদেরই জমির মালিক ঘোষণা করতে হবে" (ডকুমেন্টস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৯৭-৯৮)।

১৯২৪-এর ১১ অক্টোবর এক বিশেষ ঘোষণা জারি করে উত্তর প্রদেশের সরকার ইংরেজি ও হিন্দি দুটি ইস্তাহারকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ২০ অক্টোবরের 'দৈনিক বর্তমানে' তার প্রতিবাদ পত্র ছেপে সত্যভক্ত বললেন: "পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা করে তার ইস্তাহারকে নিষিদ্ধ করা, সরকারের পক্ষে কাপুরুষোচিত কাজ হয়েছে।" (ডকুমেন্টস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৯৮)

## সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলনের ডাক

১৯২৫-এর ১৮ জুন একটি ইস্তাহারে সত্যভক্ত জানালেন যে ১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসে কানপুরে প্রথম সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলন হবে। মানবেন্দ্রনাথ রায় সত্যভক্তর তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে লিখলেন: "সত্যভক্ত-পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা গণবিপ্লবের পথে অর্জন করায় বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়তঃ তাঁর আদর্শ আন্তর্জাতিকতাবাদ নয় জাতীয়তা।" (ডকুমেন্টস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬০৫)

ইতিমধ্যে কিন্তু ভারতের কমিউনিস্টরাও তৈরী হচ্ছিলেন প্রথম সর্ব-

ভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলন সংগঠিত করার জন্য। স্মৃতিচারণ করে, এ সম্বন্ধে কমরেড সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে লিখছেন :

"কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার পরই, বোম্বেতে 'সোস্যালিস্ট' পত্রিকার সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত ছিলাম, তারা সবাই স্থির করলাম যে ভারতে শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব বিপ্লবী দল গড়ে তুলতে হবে। ঠিক এই সময় আমাদের চোখে পড়ল যে সত্যভক্ত বলে এক ব্যক্তি কাগজে বিবৃতি দিয়ে কানপুরে এক সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলন ডেকেছে। তাকে সমর্থন জানিয়েছেন গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী, মৌলানা হসরৎ মোহানি ও কিছু কিছু বিপ্লবী গোষ্ঠী। আমার ঠিক মনে নেই, তবে যতদূর খেয়াল হচ্ছে, এম এন রায়ও আমাদের পরামর্শ দিলেন সত্যভক্তর সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রথম সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলনকে সফল করতে।" ( নিউ এজ, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬ )

## কমরেড ঘাটের সাক্ষ্য

এর আগে অন্য একটি প্রবন্ধেও কমরেড ঘাটে লিখেছিলেন : "কানপুরে সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে জন্ম দিয়ে আমরা কাজে নেমে পড়লাম। আমার মনে আছে যে ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার বিরুদ্ধে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে বিবৃতি দিয়ে পার্টির নামে আমরা একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করি।" ( ঘাটে : স্মৃতিচারণ : মাসিক নিউ এজ, এপ্রিল, ১৯৫৮ )

যাই হোক, কিভাবে শেষ পর্যন্ত ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে, কানপুর সর্বভারতীয় সম্মেলন থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জন্মগ্রহণ করল, তা আমরা কিছুটা সবিস্তারে আলোচনা করব।

কমরেড ঘাটে লিখছেন :

"জে পি বাগেরহাট্টার সংযোগ ছিল এম এন রায়ের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা দুজন কানপুর সম্মেলনে যোগ দেওয়া স্থির করলাম।" (নিউ এজ, ৬ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬)। ঘাটে লিখছেন যে সম্মেলনের প্রস্তাবাদি রচনা করার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাতে ঘাটে ছাড়াও ছিলেন সত্যভক্ত, যোগলেকর, বাগেরহাট্টা, এস হাসান ( লাহোর ) ও কৃষ্ণস্বামী (মাদ্রাজ)। ঘাটে বলছেন : "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই নামে সত্যভক্তর আপত্তি ছিল। তিনি চাইলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট

পার্টি'। শেষ পর্যন্ত তাঁর মত টিকল না, আমাদের মতই চালু রইল। পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হলেন সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার, যুগ্ম সম্পাদক হলাম আমি ও বাগেরহাট্টা। একটি কার্যকরী সভাও নির্বাচিত হল। অন্যান্যদের মধ্যে তাতে রইলেন মুজফ্‌ফর আহমদও।" (নিউ এজ, ৬ ফেব্রুঃ ১৯৬৬)।

## সত্যভক্ত দল ছাড়লেন

সম্মেলন শেষ হবার চারদিনের মধ্যেই সত্যভক্ত এই পার্টি' ত্যাগ করে চলে গেলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন "জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি" নামে একটি নতুন দল।

মুজফ্‌ফর আহমদ, তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ "আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি"তে কানপুর সম্মেলন থেকে গড়ে ওঠা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে একটা ছেলেমানুষি ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে বলেছেন। কিন্তু ঐ একই মুজফ্‌ফর আহমদ, ১৯৫৮-র এপ্রিলে "মাসিক নিউ এজ" পত্রিকাতে এক স্বাক্ষরিত প্রবন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা লিখেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে মুজফ্‌ফর আহমদ লেখেন :

"আলমোড়া জেলা জেল থেকে আমি ছাড়া পেলাম ১৯২৫-এর সেপ্টেম্বর মাসে।...সত্যভক্ত আমাকে আলমোড়াতে চিঠি লিখে কানপুর সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করলেন। কানপুরে পৌঁছে আমার দেখা হল কমরেড এস ভি ঘাটে, কে এন যোগলেকর, আর এস নিম্বকর, জে পি বাগেরহাট্টা ও অযোধ্যা প্রসাদের সঙ্গে।...

ভারতের বিভিন্ন জায়গার কমিউনিস্টরা মিলে এই প্রথম আমরা একটি সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পর্যন্ত নির্বাচিত করলাম" (মাসিক নিউ এজ, এপ্রিল ১৯৫৮)।

## মুজফ্‌ফর আহমদের মূল্যায়ন

অসুস্থ শরীরে কানপুর থেকে কলকাতা ফিরে, বাংলাদেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ। বাংলাদেশের সমস্ত সাম্যবাদীকে এই পতাকার নীচে সমবেত হবার এক প্রকাশ্য আবেদনও জানালেন মুজফ্‌ফর আহমদ : "বাংলায় যাঁরা কমিউনিস্ট আছেন, তাঁরা সমবেত হয়ে পার্টি' গঠন করুন—এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আমি

তাঁদের জানাচ্ছি।" (মুজফ্‌ফর আহমদের চিঠিঃ লাঙ্গল, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি, ১৯২৬)

এতসব প্রমাণ সত্ত্বেও কেন যে মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর শেষ জীবনের বই-এ কানপুরে অনুষ্ঠিত প্রথম সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলনকে বিদ্রূপ করলেন, তা বোঝা কঠিন। কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্ত্বিক ডঃ গঙ্গাধর অধিকারীর মূল্যায়নটিই আমাদের যথার্থ বলে মনে হয়। ডঃ অধিকারী লিখছেন: "কানপুর সম্মেলন ভারতের সমস্ত সাচ্চা কমিউনিষ্টকে প্রথম সুযোগ দিল একত্রে আলোচনা করার ও সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সংগঠনের ভিত্তি রচনা করার। কানপুরে যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচিত হল, তারাই উদ্যোগ নিয়ে সারা ভারতের প্রদেশে প্রদেশে গড়ে তুলল আইনসঙ্গত ওয়ার্কাস ও পেজান্টস পার্টিগুলি। তারাই গড়ে তুলল এদেশে প্রথম শ্রেণী সচেতন, জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষান সভা। তারাই দেশব্যাপী শ্রমিক ও কৃষকদের বৈপ্লবিক গণজাগরণের দরজা খুলে দিল।" [অধিকারী (সম্পা) : ডকুমেন্টস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬২৮-২৯]।

## কানপুর : ১৯২৫, সি পি আই-এর সম্মেলন

সেই জন্য ১৯৫৭-৫৮-তে যখন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে বিতর্ক ওঠে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম কোন বছরে হয়েছিল বলে স্থির করা হবে, তখন ১৯৫৮-তে পার্টি ঐক্যমত হয়ে সিদ্ধান্ত করে যে ১৯২৫-এ অনুষ্ঠিত কানপুর সম্মেলনকেই পার্টির জন্মলগ্ন বলে ধরা হবে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যারা প্রগতিপন্থী তাঁরা উদ্যোগ নিয়ে ১৯২৫-এর শেষের দিকে বগুড়ায় নিখিলবঙ্গ প্রজা সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করেন। সেই সম্মেলন থেকে জন্মলাভ করে একটি নতুন রাজনৈতিক দল—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ দল। এরা একটি সাপ্তাহিক মুখপত্রও বের করেন। তার নাম হয় "লাঙ্গল", তার প্রধান পরিচালক হন কবি নজরুল ইসলাম। শ্রমিক-প্রজা স্বরাজদলের সভাপতি হন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি অতুল চন্দ্র গুপ্ত ও সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত কুমার সরকার।

## শ্রমিক প্রজা-স্বরাজ দল

এই নতুন দলের কর্মসূচীতে লেখা হয় "নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক

সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা সূচক স্বরাজ্যলাভই এই দলের উদ্দেশ্য—নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তি প্রয়োগই উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায় হইবে" ("লাঙ্গল" ৭ জানুয়ারি ১৯২৬)। এই কর্মসূচীতে আরও বলা ছিল যে দলের প্রত্যেক সদস্যকে জাতীয় কংগ্রেসেরও সদস্য হতে হবে। "এই দল শ্রমিক ও কৃষকগণের স্বার্থের জন্য যুঝিবেন এবং জাতীয় কার্যে নিযুক্ত অন্যান্য দলের সহিত যতটা সম্ভব সহযোগিতা করিবেন।" (ঐ)

## দলের মুখপত্র "লাঙ্গল"

"লাঙ্গল" পত্রিকটিতে কি ধরনের লেখা থাকত, তা এখনকার পাঠকদের একটু জানা দরকার। "লাঙ্গল"-এর দ্বিতীয় সংখ্যাতে (২৩ ডিসেম্বর, ১৯২৫) ছাপা হল নজরুলের প্রসিদ্ধ গান "ওঠরে চাষী, জগৎবাসী, ধর কষে লাঙ্গল।' "লাঙ্গলের" প্রথম সংখ্যাতেই ছাপা হয় নজরুলের প্রসিদ্ধ কবিতা "সাম্যবাদী" এবং এই সংখ্যার ৫000 কপি এক দিনের মধ্যে বিক্রী হয়ে যায়। ঐ সংখ্যাতে দেবব্রত বসু কার্ল মার্কস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও লেখেন। ১৯২৬-এর ৭ জানুয়ারি "লাঙ্গল"-এর তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় নজরুলের "সব্যসাচী।" ম্যাক্সিম গোর্কির "মা" উপন্যাসের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদও ছাপা হতে থাকে। চতুর্থ সংখ্যায় "ভারত কেন স্বাধীন নয়?" নামে মুজফফার আহমদের স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধ থাকে।

১৯২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে কৃষ্ণনগরে দলের দ্বিতীয় সম্মেলন হয়। এবারও সভাপতি নির্বাচিত হন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সহসভাপতি জনাব সামসুদ্দিন ও অতুল চন্দ্র গুপ্ত, সম্পাদক হেমন্ত কুমার সরকার। সংগঠনে প্রবেশ করলেন মুজফফার আহমদ ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সম্মেলনে কমিউনিস্টদের প্রস্তাব অনুযায়ী, বহু তর্ক-বিতর্কের পর দলের নাম বদলে নতুন নাম রাখা হল "বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল।" (লাঙ্গল, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬)। এর কিছুদিনের মধ্যেই দলের নাম আরও বদলে হল "বঙ্গীয় শ্রমিক ও কৃষক দল" এবং মুখপত্রর নাম বদলে রাখা "গণবাণী" তার সম্পাদক হলেন মুজফফর আহমদ।

## কমিণ্টার্ণের তরফে অভিনন্দন

"লাঙ্গল"-কে অভিনন্দন জানিয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায় লিখলেন "নতুন

বাংলা সাপ্তাহিক 'লাঙ্গল' কে আমরা সাদর অভিবাদন জানাচ্ছি। ভারতে প্রকৃত বিপ্লবী প্রবণতা বাড়ছে—'লাঙ্গল'-এর আত্মপ্রকাশ তারই প্রমাণ। এই প্রবণতার মূল কথা : জনগণের দিকে মুখ ঘোরাও। শ্রেণীচ্যুত বুদ্ধিজীবীরা জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের গুরুত্ব বুঝতে আরম্ভ করেছেন। এটা শুভ ইঙ্গিত।...বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলাম নিপীড়িত জনগণের আশা আকাঙ্খায় ভাষা দিচ্ছেন। মুজফফর আহমদের প্রবন্ধটি ধারালো এবং স্বচ্ছ। তা জাতীয় বিপ্লবীদের মোহমুক্ত করতে সাহায্য করবে।...'লাঙ্গল' তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করুক। ভারতের গণতান্ত্রিক জাতীয় স্বাধীনতা ও পরে সমাজতন্ত্র অর্জনের সংগ্রামে সর্বহারা শ্রমিক ও কৃষক হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য মিত্র।" (মাসেস, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা, মার্চ ১৯২৬)

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই আদিপর্বের ২।৩ জন নেতার বক্তৃতা ও লেখার সামান্য উদ্ধৃতি দিয়ে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার ইতিবৃত্তর আলোচনা শেষ করব। বামপন্থী খিলাফৎ নেতা মৌলানা হসরৎ মোহানি ছিলেন আজীবন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অকৃত্রিম বন্ধু। ১৯২১-এ আমেদাবাদ কংগ্রেসে তিনিই উত্থাপন করেছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করা সংশোধনীটি। কানপুর সম্মেলনে তিনি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

## হসরৎ মোহানির বক্তব্য

প্রথম সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলনে, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে তিনি যে বক্তৃতা করেন, নানান কারণেই তা স্মরণীয়। তিনি বলেন :

"আমাদের লক্ষ্য স্বরাজ, অর্থাৎ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। যে কোনও ন্যায়সঙ্গত উপায়ে আমরা তা অর্জন করবই। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা প্রতিষ্ঠা করব সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র।...আমরা ভারতের একটি রাজনৈতিক দল, তবে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে আমাদের নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে।

...কিছু দুষ্ট লোকে প্রচার করছে যে কমিউনিস্টরা ধর্মদ্রোহী। কথাটা বিকৃত প্রচার। আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির দরজা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান বৌদ্ধ বা নাস্তিক—সকলের জন্যই উন্মুক্ত।" (ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, ১৯২৮, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭-৭১)

## সিঙ্গারাভেলুর ভাষণ

সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজের প্রবীণ শ্রমিকনেতা সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার। তিনি বলেন:

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আজ কমিউনিজমকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। এমনি করেই যীশু খ্রীষ্টকেও একদিন নিগৃহীত হতে হয়েছিল। কিন্তু ধ্বংস হয়নি তাঁর মতবাদ। তেমনই ধ্বংস হবে না মানবমুক্তির নতুন মতবাদ: কমিউনিজম।

...ভারতের ভবিষ্যত আমাদের হাতে। আমরা স্বপ্ন দেখি স্বাধীন শোষণ-মুক্ত ভারতের, যেখানে বিতাড়িত হয়েছে ক্ষুধা, মহামারী ও দারিদ্র্য, যেখানে মানুষ গাইবে শ্রমের জয়গান।" [ ডঃ অধিকারী ( সম্পা ) ডকুমেন্টস্, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৬০ ]

## শাকলাৎওয়ালার অভিনন্দন

আর ইংলণ্ডে বসবাসকারী প্রসিদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকনেতা সাপুরজি শাকলাৎওয়ালা সম্মেলনে প্রেরিত এক অভিনন্দন বার্তায় লিখলেন:

"ভারতে এখন আছে ৩১ কোটি ক্রীতদাস ও কয়েক লক্ষ দাস মালিক। এই অবস্থার আমূল রূপান্তর না ঘটালে ভারত স্বাধীন হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। এই ৩০ কোটি দাসের মুক্তির একমাত্র পথ: কমিউনিজম। সোভিয়েত রাশিয়া বিপ্লবের পর কোটি কোটি নিপীড়িত মজুর-চাষীকে দিয়েছে খাওয়া-পরা ও শিক্ষার সকল মানবিক অধিকার। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেই তা সম্ভব হয়েছে। আপনাদেরও ঐ একই পথ।" ( ডকুমেন্টস, দ্বিতীয় খণ্ড পৃঃ ৬০১-৪০ )

## ইতিহাসের নতুন পর্ব

এর পরের ইতিহাস সুবিদিত। ১৯২৭ থেকে বোম্বাই, কলকাতা, কানপুর প্রভৃতি—ভারতের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে—লালঝাণ্ডার নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক জাগরণ দেখা দিল। বোম্বাই-এর সূতাকল ও রেল শ্রমিকের এবং বাংলার রেল ও চটকল শ্রমিকের জঙ্গী ধর্মঘটে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে শ্রমিক-শ্রেণী এক নতুন ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে গেল। ইতিহাসের সেই নতুন পর্বের আলোচনা করা হবে পরবর্তী অধ্যায়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

# মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা

## ১৯২৭—যুগসন্ধিক্ষণ

ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯২৭ এক যুগসন্ধিক্ষণ। বছরটা যখন শুরু হল, তখন আপাতঃদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে যে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। "শাসন সংস্কার ব্যবস্থার ভিতরে ঢুকে তাকে বানচাল করে দেব"—স্বরাজ্য দলের এই রণকৌশল এক বাংলাদেশ ছাড়া, প্রায় সর্বত্রই ব্যর্থ হয়ে গেছে। গান্ধীবাদী অসহযোগ আন্দোলনের গতিবেগ তখন প্রায় নিঃশেষ। বিপ্লববাদীদের সেরা কর্মীরা হয় কারারুদ্ধ, নয় ফেরারী। বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনেরও তখন শৈশব। তাছাড়া কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় ও নানাবিধ দমনপীড়নে শ্রেণী সংগ্রামের আগুনও তখন ছাইচাপা পড়েছে। দেশ জুড়ে কালো ছায়া নেমেছে সাম্প্রদায়িক বীভৎসার। সমগ্র দেশে একটা অবসাদ, একটা হতাশার আবহাওয়া—শুধু সাম্রাজ্যবাদ ইংরেজরাই পরিতৃপ্ত।

কিন্তু সেই ১৯২৭ শেষ হবার আগেই দেশের চেহারা ও মেজাজ যেন সম্পূর্ণ বদলে গেল। সাম্রাজ্যবাদের মুখের পরিতৃপ্তির হাসি মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল কুঞ্চিত ললাটে গভীর দুশ্চিন্তার রেখা। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন অবসাদ ঝেড়ে ফেলে, শিরদাঁড়া সোজা করে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে এগোতে লাগল সামনের দিকেই। বিপ্লববাদীদের সেরা যুব কর্মীরা সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন মনে নিয়ে, ক্রমেই বেশী বেশী করে আকৃষ্ট হতে লাগল সমাজতন্ত্রের দিকে। বিশ্ব জোড়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যোগসূত্রও স্থাপিত হল এই বছরেই। সর্বোপরি ভারতের শ্রমিক আন্দোলন তার শৈশব অতিক্রম করে, সংগ্রামী কৈশোরে পদার্পণ করল—লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে।

## ব্রুসেলসে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মহাসম্মেলন, ১৯২৭

১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারী মাসে, ইউরোপে, বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলসে, পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন ও নিপীড়িত জাতিসমূহের প্রথম মহাসম্মেলন

অনুষ্ঠিত হল। তার উদ্যোগ সমবেতভাবে গ্রহণ করলেন কমিউনিস্টরা সমাজতন্ত্রী ও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন জার্মান কমিউনিস্ট নেতা উইলি মুনসেনবার্গ, ইংরেজ বামপন্থী শ্রমিক নেতা জেমস ম্যাক্সটন, চীনা জাতীয় বিপ্লবী নেত্রী সুংচিংলিং (মাদাম সান ইয়াৎ সেন)। আর ছিলেন অগ্নিযুগের প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিপ্লবী, সরোজিনী নাইডুর ভাই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—"চট্টো" নামেই যিনি সমাধিক খ্যাত। তরুণ জওহরলাল নেহরু তখন ইউরোপে। চট্টোর আমন্ত্রণে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি রূপেই যোগ দিলেন ব্রুসেলসের মহাসম্মেলনে।

জওহরলাল লিখছেন: "১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে ব্রুসেলসে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। কমিউনিস্টরা সেখানে বেশ জোরালো-ভাবেই উপস্থিত ছিল। নিপীড়িত জাতিদের নিজেদের মধ্যেও তাঁদের বামপন্থী শ্রমিক আন্দোলনের মিলিত সংগ্রামের কথা তখন সরবে আলোচিত হচ্ছিল। সবাই তখন মনে করছিল যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম সবাই মিলেই করতে হবে। যবদ্বীপ, ইন্দোচীন, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশ থেকে জাতীয়তাবাদী সংগঠনের প্রতিনিধিরা সেই মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন উত্তর আফ্রিকার ও আরব কৃষ্ণ আফ্রিকার নিগ্রো নেতারা, উপস্থিত ছিলেন বহু বামপন্থী, শ্রমিক নেতা। উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকজন মানুষ যাঁরা এক যুগ ধরে ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনের বরণীয় নেতা। কমিউনিস্টরা তো অবশ্যই ছিল এবং সম্মেলন পরিচালনায় তারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।"

(নেহরু: টুয়ার্ডস ফ্রীডম, পৃঃ ১২৫)

## জওহরলালের অভিজ্ঞতা

মহাসম্মেলনের উদ্বোধনের দিনে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে জওহরলাল বল্লেন: "এই আন্তর্জাতিক মহা-সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে, ভারতের জনগণ ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি নিজেকে সংযুক্ত করতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা—শোষণের যন্ত্রণা থেকে দরিদ্র ও নিপীড়িত দেশবাসীর মুক্তি। আমরা যতদূর বুঝেছি

যে সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সারা বিশ্বের ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যই এই আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। তাই আমরা এই মহা-সম্মেলনকে স্বাগত জানাই।" (ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টারলি রেজিস্টার, ১৯২৭, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২০৪—০৫)।

১৯২৭-এর শরৎকালে জওহরলাল জীবনের প্রথমবার সোভিয়েত ইউনিয়নে গেলেন। তিনি লিখছেন: "লেনিন যেমন বলেছেন, তেমনই রাশিয়া হয় তলিয়ে যাবে, নয় উদ্দাম বেগে এগিয়ে যাবে। ১০ বছর তো কেটে গেছে, রাশিয়া তো তলিয়ে যেতে অস্বীকার করেছে। ১৯১৭-র বিপ্লব যে সৃজনশীল শক্তিকে জন্ম দিয়েছিল, তা আজও ফুরিয়ে যায়নি। সেই শক্তি ইতিহাস রচনা করেছে এবং ভবিষ্যতেও তারা ইতিহাস রচনা করেই চলবে। পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রই এই শক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না" (নেহরু: সোভিয়েত রাশিয়া, ১৯২৭ পৃঃ ৫৩-৫৪)।

১৯৭৪-র শেষদিকে দেশে জাতীয় কংগ্রেসে পেশ করা তাঁর রিপোর্টে জওহরলাল প্রস্তাব করলেন যে ব্রুসেলস মহাসম্মেলন থেকে যে "সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘ" জন্ম লাভ করেছে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উচিত তার সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করা। (ব্রুসেলস মহাসম্মেলন সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতৃত্বর কাছে জহরলাল নেহরুর গোপন রিপোর্ট, জওহরলাল নেহরু স্মৃতিরক্ষা গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা, দিল্লীতে সংরক্ষিত)।

## সাকলাৎওয়ালার ভারতে আগমন

ইতিমধ্যে ১৯২৭-এর গোড়াতে আর একটি ঘটনাও ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রগতির পথে ঠেলে দিতে সাহায্য করে। তা হল, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমিউনিস্ট সদস্য ভারতীয় শ্রমিক নেতা সাপুরজী সাকলাৎওয়ালার ভারতে আগমন। মাত্র কয়েক মাস ভারতে ছিলেন সাকলাৎওয়ালা। বক্তৃতা করলেন ছোট বড় অজস্র জনসভায়. তোলপাড় করে দিলেন ভারতবর্ষকে। সর্বত্র তিনি দুটি রণধ্বনি উচ্চারণ করেছেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, দীর্ঘজীবি হোক সাম্যবাদী আন্দোলন।

১৯২৭-এর ১৮ জানুয়ারি বোম্বাইতে এসে নামলেন, দেশবাসী বিপুল সম্বর্ধনা জানাল সাকলাৎওয়ালাকে। সভায় উপস্থিত ছিলেত শত শত কংগ্রেসসেবী ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী এবং মৌলানা শওকৎ আলি, শ্রীমতী সরোজিনি নাইডু

এবং বি জি হর্নিম্যানের মত প্রসিদ্ধ জননায়কবৃন্দ। (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ১৯ জানুয়ারি, ১৯২৭) সভানেত্রীর আসন থেকে শাকলাৎওয়ালাকে স্বাগত জানিয়ে সরোজিনি বল্লেন: "স্বাধীনতা ও মৃত্যুর মধ্যে স্বাধীনতাকেই একমাত্র বিকল্প বলে বেছে নিয়েছে ভারতের যে পুনরুজ্জীবিত মর্মাত্মা সাকলাৎওয়ালা তারই প্রতিমূর্তি।" (ঐ)

উত্তরে সাকলাৎওয়ালা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্রের মুখোস ছিঁড়ে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে এই বলে বক্তৃতা শেষ করলেন: "ধ্বংস কর সেই সমাজ-ব্যবস্থাকে, যা বিভক্ত করেছে দুনিয়াকে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে।" (ঐ)

ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগে সাকলাৎওয়ালা আসেন। কলকাতার পৌরসভায় তখন কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মেয়র। পৌরসভার ইংরেজ সদস্যদের তীব্র বাধা সত্ত্বেও কলকাতা পৌরসভা স্থির করে যে ২০ ফেব্রুয়ারি, কলকাতার টাউন হলে তারা সাকলাৎওয়ালাকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানাবে। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বঙ্গীয় শাখাও ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায় ১৯ জানুয়ারি। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২০ জানুয়ারি ১৯২৭) শ্রমিক সমাবেশে তাঁর ভাষণে সাকলাৎওয়ালা বল্লেন: "সাম্যবাদই পৃথিবীর ভবিষ্যত। বর্তমানের খুনী ও দুর্বৃত্ত সমাজকে চূর্ণবিচূর্ণ করেই সাম্রাজ্যবাদ বিজয়ী হবে। তাই আপনাদের কাজ নিজেদের সংগঠিত করা। সাম্যবাদের আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে এগিয়ে চলুন, সাম্যবাদের ভিত্তিতে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।" (অমৃত-বাজার পত্রিকা ২১ জানুয়ারি ১৯২৭)

পরের দিন পৌর সম্বর্ধনা সভাতেও দীর্ঘ চমকপ্রদ ভাষণ দেন সাকলাৎওয়ালা। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কমিউনিস্ট মতবাদকে অপছন্দ করতেন। কিন্তু সাকলাৎওয়ালার ভাষণে মুগ্ধ হয়ে, মেয়েদের প্রত্যুত্তরে তিনি বল্লেন "সাকলাৎওয়ালার বক্তৃতা শোনার পর, কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে যে সব সন্দেহ ও প্রতিকূল ধারণা আমার মনে ছিল, এখন আর তা নেই—একথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারি" (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২১ জানুয়ারি, ১৯২৭।)

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ও তৎকালীন বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা রাধারমন মিত্র ঐ জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে

সম্প্রতি তিনি বলেন "সাকলাৎওয়ালার দুটি সভাতেই আমি ছিলাম। এ রকম অসাধারণ বাগ্মীতা আমি শুনি নি বললেই চলে।" (রাধারমন মিত্র : লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা' ২৮ এপ্রিল ১৯৭৯)

## ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সাকলাৎওয়ালা

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল দিল্লীতে, মার্চ মাসে। সেখানেও সাদর সম্বর্ধনার উত্তরে সাকলাৎওয়ালা ওজস্বিনী ভাষাতে বললেন : "শ্রমিকরা যদি সমাজের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, তাহলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তামাশায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের দৃঢ় লক্ষ্য হওয়া উচিত ধনবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করে শ্রমিকদের কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা" (ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টারলি রেজিস্টার, ১৯২৭, প্রথম খণ্ড, পৃঃ.৪৪১)। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসও এক প্রস্তাব গ্রহণ করে জানাল "এই মহাসম্মেলনে, ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর তরফ থেকে পার্লামেন্টের সদস্য সাপুরজী সাকলাৎওয়ালাকে সাদর অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং ভারতের কোটি কোটি শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করেছেন, তার জন্য তাঁকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।" (লেবার মান্থলি, লণ্ডন, নবম খণ্ড, ৭ সংখ্যা, ১৯২৭, পৃষ্ঠা ৪৪৩)

এই সময় অবধি ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে কমিউনিস্টরা একটা ছোট শক্তি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের উদ্যোগে এবং সম্ভবতঃ সাকলাৎওয়ালার প্রভাবে টি ইউ সি-র এই মহাসম্মেলনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়—চীন থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে এবং বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আশা প্রকাশ করে। (ঐ)

তাছাড়া এই মহাসম্মেলনে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটে। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে এই প্রথম লালঝাণ্ডা উত্তোলন করা হয় এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে কারখানার শ্রমজীবী প্রতিনিধিরা প্রকাশ্যে সর্বপ্রথম ধ্বনি তোলেন "লাল ঝাণ্ডা কি জয়।" (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর : হিস্টরিক্যাল ডেভেলপমেন্ট অফ কমিউনিস্ট মুভমেন্ট ইন ইণ্ডিয়া, কলকাতা, ১৯৪৪, পৃঃ ১১)।

## খড়্গপুরে রেল ধর্মঘট

১৯২৭-এর ১২ ফেব্রুয়ারি খড়্গপুরে ২৫ হাজার রেল শ্রমিক ধর্মঘট করল। ইংরেজ সরকার ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য ফৌজ পাঠাল, কিন্তু শ্রমিকরা অদম্য মনোবল নিয়ে রুখে দাঁড়াল। রেল শ্রমিক নেতা ভি ভি গিরির সঙ্গে সাকলাৎওয়ালাও ছুটে গেলেন খড়্গপুরে। কিন্তু সরকার তাঁকে শ্রমিক জমায়েতের সামনে বক্তৃতা করতে দিল না। তিনি কলকাতায় ফিরে এসে এই দমননীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৭)।

মার্চের মধ্যভাগে ধর্মঘটের অবসান হল। বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের মালিকরা প্রতিশ্রুতি দিল যে কোনও ধর্মঘটীকেই শাস্তি দেওয়া হবে না এবং শ্রমিকদের দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। কিন্তু পরে সেই প্রতিশ্রুতিকে পদদলিত করে, রেল কর্তৃপক্ষ ২ হাজার রেল শ্রমিককে ছাঁটাই করার হুমকি দিল। ১৯২৭-এর ৭ সেপ্টেম্বর কর্তৃপক্ষ ১৭০০ শ্রমিককে বরখাস্ত করার নোটিশ জারী করল। ফলে পরের দিন সমস্ত শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। ১২ সেপ্টেম্বর কর্তৃপক্ষ খড়্গপুরে লক-আউট ঘোষণা করল। (স্টেটসম্যান, কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭)।

এর পরে যা ঘটল, তা বিদ্যুৎ ঝলকের মত বুঝিয়ে দিল যে সারা দেশে শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী মেজাজ কোন পর্যায়ে উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সারা ভারত জুড়ে রেল শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট করল। প্রতিবাদ জানাল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, এমন কি নরমপন্থী শ্রমিক নেতারাও। কেন্দ্রীয় আইনসভা, ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখ সরকারের বিরুদ্ধে একটা নিন্দাসূচক প্রস্তাবও পাশ করল। (কেন্দ্রীয় আইনসভার কার্যবিবরণী, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৭)। নরমপন্থী দুই শ্রমিক নেতা এন এম যোশী ও দেওয়ান চমনলাল তীব্র ভাষায় সরকারকে ধিক্কার দিলেন (ঐ)।

খড়্গপুরের রেল শ্রমিকরা ধর্মঘটে সংগ্রামী ঐক্য অটুট রাখল। ৩১ অক্টোবর খড়্গপুরে সারা ভারত রেল শ্রমিক ফেডারেশনের বিশেষ সম্মেলন আহুত হল। সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করল যে "নিখিল ভারত রেল শ্রমিক ফেডারেশনের এই সম্মেলন সরকারের ছাঁটাই করার নীতিকে ধিক্কার জানাচ্ছে এবং ঘোষণা করছে যে সাধারণ ধর্মঘটই এখন একমাত্র পথ।"

( টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ২ নভেম্বর, ১৯২৭ )। সম্মেলন আরও সিদ্ধান্ত করল যে এই ধর্মঘটকে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথের সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। পরদিন বেঙ্গল-নাগপুর রেল শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ভি ভি গিরি এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়ে ঘোষণা করলেন যে রেল শ্রমিকদের সামনে এখন একমাত্র যে পথ খোলা আছে, তা হচ্ছে সাধারণ ধর্মঘট। ( টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ৩ নভেম্বর ১৯২৭ )। খড়্গপুরের এই ধর্মঘট চলে দীর্ঘ ৬ মাস ধরে এবং তার সমর্থনে, বিশেষতঃ বাংলাদেশের রেল শ্রমিকদের মধ্যে এক গণজাগরণ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সেসব ঘটে ১৯২৮-এর প্রথম দিকে, ফলে তা যথাস্থানেই আলোচিত হবে।

## সাইমন কমিশন বিরোধী বিক্ষোভ

ইতিমধ্যে ইংরেজ সরকার ঘোষণা করল যে ভারতে শাসন সংস্কারের জন্য, সার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশনকে তারা শীঘ্রই ভারতে পাঠাচ্ছে। অবসাদগ্রস্ত জাতীয় আন্দোলন যেন রূঢ় কষাঘাতে চমকে জেগে উঠল প্রায় একবাক্যে সাইমন কমিশনকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত নিল। এই পটভূমিতেই ১৯২৭-এর ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। সেখানে বিষয় নির্বাচক কমিটির সভাতে, বোম্বাই-এর কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা কে এন যোগলেকর ( পরে ইনিও মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হন ) একটি ছোট্ট প্রস্তাব পেশ করেন যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা ( ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টারলি রেজিস্ট্রার, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯২৭ )। ১৯২১ থেকে শুরু করে কংগ্রেসের প্রতিটি বাৎসরিক অধিবেশনেই কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা এই মর্মে প্রস্তাব উত্থাপন করে আসছিলেন, কিন্তু কোনওবারেই তাঁরা ১০|১২টির বেশী ভোট পান নি। ১৯২৭-এ যোগলেকরের প্রস্তাবকে সমর্থন করতে ওঠে দাঁড়ালেন তরুণ জননায়ক জওহরলাল নেহরু এবং প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনিই উত্থাপন করলেন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবটি। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তা গৃহীতও হয়ে গেল। ( পট্টভি সীতারামাইয়া : হিস্ট্রি অফ দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩১৯ )। গান্ধীজি এই অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়েছে শুনে বিরূপ মন্তব্য করেন।

## কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশন, ১৯২৭

কংগ্রেসের এই মাদ্রাজ অধিবেশনেই জওহরলাল প্রস্তাব আনলেন সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী সংঘের সঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অন্তর্ভুক্ত হোক এবং অধিবেশন প্রস্তাবটি অনুমোদন করল। যুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে স্পষ্টভাবেই বলা হল যে "ইংরেজ সরকার যদি যুদ্ধের চক্রান্তে লিপ্ত হয় এবং ভারতকে সেই চক্রান্তের যাঁতাকলে জুড়ে দেবার চক্রান্ত করে, তাহলে ভারতের জনগণের কর্তব্য হবে সেই যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে সর্বতো-ভাবে অসহযোগিতা করা।" (ডরোথি নর্ম্যান সম্পাদিত: নেহরু, দি ফার্স্ট সিক্স্টি ইয়ার্স, দিল্লী, ১৯৬৫, পৃঃ ১৪২)

এই সংগ্রামী মেজাজেই পরিসমাপ্তি ঘটল ১৯২৭-এর। জাতীয় কংগ্রেস এই প্রথম পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন জানাল। সাইমন কমিশনকে বর্জন করার ডাককে গ্রহণ করল সারা দেশ। সমস্ত দমনপীড়ন অগ্রাহ্য করে, বার বার কঠোর ও রক্তাক্ত শ্রেণীসংগ্রামের পথে পা বাড়াল ভারতের শ্রমিকশ্রেণী। আর কমিউনিস্টরা এই প্রথম ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে তাদের বৈশিষ্ট্য-তার ছাপ রাখল। একজন অ-কমিউনিস্ট লেখকের ভাষায় "বেঙ্গল নাগপুর রেল ধর্মঘটই প্রথম ধর্মঘট যাতে কমিউনিস্টরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এর পরের বছরগুলিতে কমিউনিস্টরা বহু ধর্মঘটে অংশ নেয়। ধর্মঘটের চরিত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তন এনে দেয় কমিউনিস্টরাই।" (ভি বি কার্নিক: স্ট্রাইকস ইন ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ১৯৬৭ পৃঃ ১৬৩)।

ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর ব্যাপক ও জঙ্গী গণ সংগ্রামের জন্যই ১৯২৮ ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমগ্র বছর ধরেই বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর ভারত ও বাংলাদেশে শ্রমিকশ্রেণীর উত্তাল গণসংগ্রাম চলেছিল। আর তার নেতৃত্ব দিয়েছিল কমিউনিস্টরা ও তাদের শ্রেণী সচেতন অনুগামীরাই। ১৯২৮-এর মধ্যভাগের একটি দিনের, একটি সংবাদপত্রের কয়েকটি মাত্র শিরোনামা তুলে দিচ্ছি, তারই প্রমাণ হিসাবে:

"লিলুয়ার ধর্মঘট পরিস্থিতি অব্যাহত" "খড়গপুরের শ্রমিকরা সংগ্রামে দৃঢ় রয়েছে।"

"কেশোরাম সূতাকলের 4500 শ্রমিক ধর্মঘট করেছে।

"কানপুরের এলগিন মিলে ধর্মঘট—শ্রমিকরা স্ট্রাইক কমিটি নির্বাচিত করেছে

"জামশেদপুরে হরতালের আহ্বান"

এ সব কটি খবরই বেরিয়েছিল "টাইমস অফ ইণ্ডিয়া"তে ১৯২৮-এর ১ জুনে।

## লিলুয়ায় রেল ধর্মঘট

১৯২৭-এর সেপ্টেম্বরে বেঙ্গল-নাগপুর রেল শ্রমিকদের যে ধর্মঘট শুরু হয়েছিল, তা ১৯২৮-এ পুরোদমে চলতে লাগল। সেই ধর্মঘট প্রসারিত হল কলকাতার কাছে রেল মজুরদের বিরাট কর্মকেন্দ্র লিলুয়াতে। সেই লিলুয়া ধর্মঘটের অন্যতম নেতা, তৎকালীন শ্রমিক ও কৃষক দলের একজন প্রধান সংগঠক ও কমিউনিস্ট গোপেন চক্রবর্তী সংগ্রামের এক জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন:

"লিলুয়ার শ্রমিকদের কাছে আবেদন করা এক ইস্তাহার হাজারে হাজারে শ্রমিকদের মধ্যে বিলি করে, কারখানার গেটে এক জনসভা ডাকা হল। সভার আশে-পাশে কয়েক হাজার শ্রমিক ভীড় করে রইল, কিন্তু গেটের সামনের সভাস্থলে প্রথমে অল্প শ্রমিকই এল। জটাধারী বাবা, যার আসল নাম কিরণ মিত্র, পূর্ব ভারতীয় রেল মজদুর ইউনিয়নের যিনিই ছিলেন প্রকৃত নেতা, চমৎকার হিন্দীতে শ্রমিকদের কাছে ভাষণ দিলেন। আমরাও বল্লাম, বিশেষতঃ খড়গপুরের ধর্মঘটীদের সমর্থনে। ইতিমধ্যে গুটি গুটি শ্রমিকরা সভাস্থলে চলে এল। সভা শেষ হল প্রচণ্ড উদ্দীপনার মধ্যে। বাঙলাদেশে এই বোধহয় সর্বপ্রথম সভার শেষে হাজার শ্রমিক বজ্রধ্বনি দিল; লাল ঝাণ্ডা কি জয়। (গোপেন চক্রবর্তী: লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। ফেব্রুয়ারি মার্চ ১৮৬৯)। গোপেন চক্রবর্তী আরও বলছেন; "কিরণ মিত্র, ধরণী গোস্বামী, শিবনাথ ব্যানার্জী এবং আমি ছিলাম ধর্মঘটের প্রধান সংগঠক। স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের ভার ছিল আমার উপর; শিবনাথ ছিল প্রধান বক্তা। দেখতে দেখতে প্রায় ২ হাজার শ্রমিকের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে উঠল এবং তারা পালা করে ২৪ ঘণ্টাই কারখানা পাহারা দিত, যাতে দালালরা কোনও ক্ষতি না করতে পারে। তবু কারখানার প্রাণকেন্দ্র, লোকো শেড কতৃপক্ষ চালু রেখেছিল, প্রধানতঃ ফিরিঙ্গি শ্রমিকদের সাহায্যে।

লোকোশেডটি অবস্থিত ছিল কয়েক মাইল দূরে, বামুনগাছিতে। ফলে একদিন আমরা কয়েক হাজার ধর্মঘটী শ্রমিকদের মিছিল নিয়ে যাত্রা করলাম

বামুনগাছির দিকে। পথে এল বাধা, গুলি চালাল পুলিস, ৫ জন শ্রমিক মারা গেল। প্রতিবাদে মুখর হল হাওড়া অঞ্চলের সমস্ত শ্রমিক—জেসপ, বার্ণ ও অন্যান্য কারখানার তামাম মজুর ধর্মঘট করে সৌহার্দ্য জানাল লিলুয়ার ধর্মঘটীদের সঙ্গে।' (গোপেন চক্রবর্তী : সাক্ষাৎকার)।

১৯২৮-এর মে মাসে ধর্মঘটী লিলুয়া শ্রমিকদের সমর্থনে যুক্ত বিবৃতি দিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মৃণালকান্তি বসু। সারা বাঙলার শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে ধর্মঘট তহবিলে সাহায্য এল ৫০ হাজার টাকা। ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল অণ্ডালে, আসানসোলে, অন্যান্য কেন্দ্রেও। লিলুয়ার ধর্মঘটী নেতাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন অন্যান্য শ্রমিক নেতারাও।

## সেযুগের প্রধান শ্রমিক নেতারা

এইখানে বলে রাখা ভাল যে গোপেন চক্রবর্তী ও ধরণী গোস্বামী দুজনেই ছিলেন বিপ্লবী অনুশীলন দলের পুরাণো কর্মী, যাঁরা ধীরে ধীরে কমিউনিস্ট মতবাদের দিকে ঝুঁকছিলেন। ১৯২৭-এ তাঁরা দুজনেই যোগ দিয়েছিলেন শ্রমিক ও কৃষক দলে। অপরদিকে রাধারমণ মিত্র ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ছিলেন একনিষ্ঠ কংগ্রেস সেবী। অসহযোগ আন্দোলন করে উত্তর প্রদেশের এটোয়া জেলাতে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন রাধারমন মিত্র। পরে গান্ধীবাদী নেতৃত্ব সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কলকাতায় ফিরে তিনি আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন শ্রমিক আন্দোলনে। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ছিলেন রাধারমণ মিত্রর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর অনুগামী। কিন্তু লিলুয়ার রেল শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম তাঁদের মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল এবং ক্রমশঃ তাঁরাও জড়িয়ে পড়লেন সেই লড়াই-এ।

ইতিমধ্যে দুজন ইংরেজ কমিউনিস্ট ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে বন্ধু হিসেবে এদেশে এসেছিলেন—ফিলিপ স্প্র্যাট ও বেনে ব্র্যাডলি। ব্র্যাডলির কর্মক্ষেত্র ছিল বোম্বাই, আর স্প্র্যাট বেছে নিয়েছিলেন বাংলাদেশকে। ফলে স্প্র্যাটও ছিলেন লিলুয়ার সংগ্রামের একজন অংশীদার। রাধারমন মিত্র বলছেন :

"কিরণ মিত্রর অনুরোধে রেলপথে ধর্মঘটকে ছড়িয়ে দেবার জন্য আমরা

প্রথম গেলাম অণ্ডালে। আমাদের দলটা ছিল স্প্র্যাট, ধরণী, গড়বড়ে, চিরঞ্জীলাল স্রফ ও আমি। এক সপ্তাহ দাঁতে দাঁত দিয়ে তারপর চেষ্টা হল। সেখানকার রেলমজুররা নামল ধর্মঘটের রাস্তায়। লিলুয়ার ধর্মঘট যতদিন চালু ছিল, অণ্ডালের শ্রমিকরাও আর ততদিন কাজে ফিরে যায় নি। একই ধরনের, অভিজ্ঞতা হল আসানসোলে। সেখানেও অনেক কাঠখড় পোড়াবার পর শ্রমিকদের ধর্মঘটে নামাতে সক্ষম হলাম এবং দুমাস তারা ধর্মঘটে দৃঢ় রইল।” (রাধারমণ মিত্র, সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ২৮।৪।১৯৭৮)

## লিলুয়ার সংগ্রামের তাৎপর্য

১৯২৮-এ যতগুলি বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে, বেঙ্গল নাগপুর রেল-শ্রমিকের এই ধর্মঘট ছিল তার মধ্যে খুবই ব্যাপক, কঠোর ও রক্তাক্ত। ১৬,৩১৫ জন রেলশ্রমিক দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘট করেছিল—লিলুয়ার কারখানায় ১১,২৯৬ জন, অণ্ডালে ৫৯৬ জন, আসানসোলে ১৫৩০, হাওড়াতে ২০০১ জন ও বাকীরা ছোটখাটো কেন্দ্রগুলি থেকে। ( ভি. বি. কার্ণিক : স্ট্রাইকস ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ২১১ )

১৯২৮-এর ১০ জুলাই লিলুয়ার সংগ্রামের নেতারা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলেন। একটি প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী পত্রিকা লিখল : “লিলুয়াও কি পরাজয় মানিয়া লইয়াছে? শ্রমিকরা কারখানায় ফিরিয়া গিয়াছে। ফিরিবার সময় পরাজয়ের গ্লানি লইয়া ফেরে নাই, তাদের মুখে চোখে প্রকাশ পাইয়াছে একটা দৃঢ়তার, একটা স্থির প্রতিজ্ঞার ভাব। তাহারা শক্তিসঞ্চয় করিবে, কাহারও কৃপাকণা ভিক্ষা করিবেনা। শক্তিসঞ্চিত হইলে পুনরায় তাহারা তাহাদের দাবি উপস্থিত করিবে, স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবে।” আত্মশক্তি, কলকাতা, ১৩ জুলাই, ১৯২৮)।

বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যান্য কর্মীরাও এই সময়ে শ্রমিকদের আকৃষ্ট হতে শুরু করেছিলেন। গোপেন চক্রবর্তী তাঁর পূর্বোদ্ধৃত সাক্ষাতে আর এক জায়গায় বলেছেন যে লিলুয়া ধর্মঘটের সময় একদিন তিনি ও শিবনাথ ব্যানার্জি গ্রেপ্তার হলে শ্রমিকদের সঙ্গে সশস্ত্র পুলিসদের একটি সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষের সময় ধর্মঘটী শ্রমিকদের সাহায্য করে একদল বিপ্লবী যুবক, যাঁদের নেতৃত্ব দেন সর্দার ভগৎ সিং-এর সহকর্মী বটুকেশ্বর

দত্ত। অবশ্য তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনযোগ্য অকাট্য প্রমাণ এখনও পুরোপুরি পাওয়া যায় নি।

ডাঃ রনেন সেন ছিলেন ত্রিশের দশকের গোড়া থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি বলছেন: "আমরা তখন বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সবে সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকছি। ঠিক সেই সময় লিলুয়া ধর্মঘট আমার মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। সামনে মেশিনগান হাতে ফৌজ, মাঝখানে কয়েকহাজার ধর্মঘটী রেলশ্রমিক, মাথা উঁচু করে লালঝাণ্ডা হাতে, ধ্বনি দিতে দিতে কলকাতা কাঁপিয়ে চলেছে—সর্বহারার নেতৃত্ব কাকে বলে, এই প্রথম দেখলাম।" (ডঃ রনেন সেন: লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ৫ জুলাই, ১৯৭৮)।

সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লিলুয়ার রেল শ্রমিকদের শ্রেণী-সচেতনতা যে কতটা প্রখর হয়েছিল, তার দৃষ্টান্তও প্রচুর। এই সংগ্রামে ছাঁটাই হওয়া বহু শ্রমিক চাকরী নেন আশে পাশের চটকলে, গঙ্গার ওপারে মেটিয়াব্রুজে হাড্ডিকলে ও অন্যত্র। সেইসব জঙ্গী ছাঁটাই শ্রমিকদের উদ্যোগেই গড়ে ওঠে বহু চটকলে ও কেশোরাম সুতাকলে শ্রমিক ইউনিয়ন। বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের বর্ষীয়ান নায়ক মণি সিং তখন তরুণ বিপ্লবী কর্মী সবে সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। তিনি বলছেন: "গোপেন, ধরণীর অনুরোধে আমি মেটিয়াব্রুজে গেলাম (১৯২৮) শ্রমিক সংগঠন গড়তে কাজ শুরু করলাম কেশোরাম সূতাকলের মজুরদের মধ্যে। আমি তখনও কমিউনিস্ট হইনি, কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছি সমাজতন্ত্রের দিকে। শ্রমিকদের মেজাজ তখন খুবই অশান্ত আর তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল কয়েকজন ছাঁটাই রেলশ্রমিক, যারা লিলুয়া থেকে কাজের সন্ধানে মেটিয়াব্রুজ এসেছিল। তাদেরই সহযোগিতায় আমরা গড়ে তুললাম প্রথমে কেশোরাম সূতাকল মজদুর ইউনিয়ন ও পরে বিভিন্ন চটকলে মজদুর ইউনিয়ন। এক বছরের মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়লাম চটকলে সাধারণ ধর্মঘটের জোয়ারে" (মনি সিং: লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ৪ আগস্ট ১৯৭৯)

বাংলার বিপ্লবীদের অগ্রগণ্য নেতা সতীশ পাকড়াশীও বলছেন: "আমরা কি শুধু বই পড়ে কমিউনিজমের দিকে এসেছিলাম? মোটেই না। যেসব সংগ্রাম আমাদের উদ্দীপিত করেছিল, লিলুয়ার রেলশ্রমিকদের সংগ্রাম তারই

অন্যতম।" (গৌতম চট্টোপাধ্যায় ; কমিউনিজম্ অ্যাণ্ড বেঙ্গলস ফ্রীডম মুভমেন্ট, প্রথম খণ্ড, পরিশিষ্ট গ)

## শ্রমিক সংগ্রামে উত্তাল বঙ্গদেশ

১৯২৮-এর জুন-জুলাই মাসে বাংলাদেশে ধর্মঘটের স্রোত বইতে লাগল। মণি সিং ছুটলেন মেটিয়াব্রুজে, রাধারমন মিত্র ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় গেলেন চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়াতে। রাধারমন মিত্র বলছেন : "১৯২৮-এ বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অভূতপূর্ব গণজাগরণ দেখা দিল। চেঙ্গাইলেই আমি প্রথম সংগঠিত করলাম বেঙ্গল চটকল শ্রমিক ইউনিয়ন। দেখতে না দেখতেই ধর্মঘটের পথে পা বাড়াল চেঙ্গাইলের শ্রমিকরা। সাহেব মালিকরা ধর্মঘট ভাঙার জন্য সব কিছুরই আশ্রয় নিল—ছল-চাতুরি, চোখরাঙানি, দমন-পীড়ন। এত বড় ধর্মঘট আমি একা সামলাতে পারছিলাম না। তাই আমি ডাক দিলাম প্রথমে বঙ্কিমকে, পরে ফিলিপ স্প্র্যাটকে। দুজনেই সে ডাকে সাড়া দিয়ে চেঙ্গাইলে চলে এল।" (রাধারমন মিত্র : সাক্ষাৎকার, ১৯৭৯)

এই প্রসঙ্গে ফিলীপ স্প্র্যাটও লিখছেন : "আমার কাজ ছিল ধর্মঘটীদের সভামঞ্চে উঠে, তাদের মনোবল অটুট রাখতে সাহায্য করা। সেই যুগে একজন সাদা চামড়ার সাহেবও তাদের পক্ষে আছে, এটা তাদের খুব উৎসাহ দিত। সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমি তখন চেঙ্গাইলে গেছি, মাঝে মাঝেই ছোট্ট একটি চায়ের দোকানে রাতও কাটিয়েছি। অবশ্য চটকলে ব্যাপক ধর্মঘট দানা বেঁধে উঠবার আগেই লিলুয়ার রেল ধর্মঘটের সমর্থনে রেলশ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলনেও আমি গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ি। চেঙ্গাইলে ধর্মঘটের প্রধান নেতা ছিল, যতদূর মনে পড়ে, রাধারমন মিত্র। সে-ই আমাকে ও অন্যান্যদের ডেকে পাঠিয়েছিল। গোপেন ও বঙ্কিমও চেঙ্গাইলে গিয়েছিল এবং হয়তো এক আধবার মুজফ্ফার আহমদও।" (ফিলিপ স্প্র্যাট : গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ইংরেজি চিঠির, (২৩।৫।১৯৭০) বাংলা অনুবাদ)

## বোম্বাইয়ের শ্রমিক সংগ্রাম

শ্রমিকদের এই জঙ্গী লড়াই বাংলার বাইরেও ব্যাপক ও তীব্র আকার ধারণ করেছিল, বিশেষতঃ বোম্বাইয়ে। ১৯২৭-২৮-এ বোম্বাইয়ের শ্রমিক-শ্রেণীর অবস্থাটা কেমন ছিল? সরকারি বিবরণ থেকে নিচের

মর্মান্তিক চিত্রটি বেরিয়ে আসে (সূতাকল শ্রমিকদের মাসিক আয়ের গড়পড়তা ):

| | বোম্বাই | | | আমেদাবাদ | | | শোলাপুর | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | টাকা | আনা | পাই | টাকা | আনা | পাই | টাকা | আনা | পাই |
| পুরুষ | ৪৪ | ৩ | ৬ | ৩৮ | ৪ | ০ | ২৬ | ১০ | ২ |
| মেয়ে | ২০ | ৪ | ৬ | ২১ | ১ | ৬ | ১১ | ৬ | ৭ |
| শিশু | | | | ৯ | ৪ | ৮ | ৬ | ১৩ | ১০ |

( ভারতে রয়্যাল কমিশন অব লেবারের বিবরণী, জুন ১৯১, পৃঃ ১৯৭ )

ঐ একই বিবরণী থেকে জানা যায় যে শতকরা ৭০ জন সূতাকল শ্রমিক প্রায় সব সময়ই দেনায় ডুবে থাকতেন এবং নিজেদের মাইনের শতকরা ২০ ভাগই তাঁদের বেরিয়ে যেত সেই দেনার মাসিক সুদ দিতে। ( ঐ, পৃঃ ২২০ )

বোম্বাইয়ের শতকরা ৯৭ জন শ্রমিকই ঠাসাগাদা করে একটা মাত্র ঘরে থাকতেন। বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের মধ্যে শিশু মৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৩৫০ করে (ঐ পৃঃ ২৭০-৭১)

এই ছিল পটভূমি যখন বোম্বাইয়ের সূতাকলগুলি স্থির করল যে একটা নতুন কায়দায় তারা তাঁত বোনাবে। এই নতুন পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেক তাঁতীকে দুটোর জায়গায় তিনটে তাঁত চালাবার দায়িত্ব নিতে হবে এবং একজন শ্রমিককে বোনাবার কাঠামোর দুদিকেরই দায়িত্ব নিতে হবে। সূতাকল মালিকদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা ভালই ব্যবস্থা ছিল, কেননা এতে উৎপাদনের খরচা কমে যায়। কিন্তু এতে বহু তাঁতী অনিবার্যভাবে ছাঁটাই হত এবং বাকীদের উপর কাজের চাপ ভয়ানক রকম বেড়ে যেত। ফলে শ্রমিকরা এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করল।

বোম্বাইয়ে তখন দুটি প্রধান শ্রমিক সংগঠন ছিল—এন এম যোশীর মতো নরমপন্থীদের পরিচালনাধীন বোম্বাই সূতীকল শ্রমিক ইউনিয়ন এবং এ এ আলওয়ে পরিচালিত অপেক্ষাকৃত জঙ্গী গিড়নি কামগড় মহামণ্ডল। উভয় ইউনিয়নই মালিকদের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। তৈরি হল একটা দীর্ঘ ধর্মঘটের ভিত্তি। ( কে এন যোগলেকর: পি সি যোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ১৯৬৬, যোশীর সৌজন্যে প্রাপ্ত )

কমিউনিস্টরা তখন সংখ্যায় কম। আইনীভাবে তারা কাজ করছিল শ্রমিক ও কৃষকদলের এবং ছোট সদ্য গঠিত গিড়নি কামগড় ইউনিয়নের মাধ্যমে। তারা আলওয়ের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা গড়ল এবং ১৯২৮-এর ১৫ এপ্রিল মহানগরীর সূতাকল শ্রমিকদের এক বিশাল জমায়েত সংগঠিত করল। ২০ হাজার শ্রমিক সেই জনসভায় এল। বক্তৃতা করলেন আলওয়ে, ঝাবওয়ালা, নিম্বকর প্রভৃতি। আর তাঁরা সবাই আহ্বান জানালেন সুতাকলগুলিতে সাধারণ ধর্মঘটের। (টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ১৬ এপ্রিল ১৯২৮)।

১৭ এপ্রিল বোম্বাই-এর শতকরা ৭০টি সূতাকলই ধর্মঘটের আহ্বানে সাড়া দিল এবং ২৬ এপ্রিলের মধ্যে শ্রমিকদের সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘটে প্রায় সমস্ত সূতাকলই অচল হয়ে গেল। এমনকি নরমপন্থী নেতারাও ধর্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য হলেন। ২ মে তারিখে, সমস্ত ধর্মঘটিদের এক বিশাল সম্মিলিত জনসভাতে, সব কটি ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি সম্মিলিত ধর্মঘট কমিটি গঠন করল এবং ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘটকে বিজয়ী করার প্রতিজ্ঞা নিল। (টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ৩মে, ১৯২৮)

## দীর্ঘ, রক্তাক্ত সাধারণ ধর্মঘট

তারপর প্রায় ৬ মাস ধরে, বোম্বাইয়ের ২ লক্ষেরও বেশী সূতাকল মজুর, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের নেতৃত্বের পরিচালনায় বীরত্বপূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট চালিয়ে গেল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের ও বিভিন্ন মতের রাজনৈতিক কর্মীদের সম্মিলিত করে গঠিত ধর্মঘট কমিটিই দিল সেই নতুন নেতৃত্ব। দীর্ঘ ও রক্তাক্ত সাধারণ ধর্মঘট পরিচালনার নরমপন্থী ও সংস্কারবাদী ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা ক্রমেই শ্রমিক সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল এবং সামনে এগিয়ে এল কমিউ-নিস্ট ও কমিউনিস্ট-দরদী শ্রমিক নেতৃত্ব। তাদের সংগ্রামী হাতিয়ার হল তাদের গণ-সংগঠন—গিড়নি কামগড় ইউনিয়ন।

এই নতুন প্রক্রিয়ার বিকাশের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন সে যুগের অন্যতম কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা কে এন যোগলেকর: "ধর্মঘট সংগ্রাম পরিচালনার মধ্য দিয়েই শ্রমিকরা গড়ে তুলল, ধারালো করল, তাদের সংগ্রামের অস্ত্রকে—যুক্ত ধর্মঘট কমিটি। সাধারণ শ্রমিকদের চাপে নরমপন্থী অংশও সংগ্রামে দৃঢ় থাকতে বাধ্য হল। যখন সংগ্রামের অবসান হল তখন ধর্মঘটের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শ্রমিকরা বুঝতে পারল তাদের শ্রেণী সংগঠনের তাৎপর্য। আর

সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই অল্প কয়েক মাসের মধ্যে তারা গড়ে তুলল মহাশক্তিধর এক সংগঠন—গিড়্নি কামগড় ইউনিয়ন।" (কে এন যোগলেকরের বিবৃতি: মীরাট মামলার নথিপত্র, পৃঃ ১৯৩৬)।

ঐ ধর্মঘট সংগ্রামের অপর একজন প্রধান সংগঠক এস এস মীরাজকরও একই ধরনের কথা বলছেন: "১৯২৮-এর গোড়াতেই বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘটের জোয়ার জেগেছিল। ডাঙ্গে, যোগলেকর, নিম্বকর এবং আমি তাদের মধ্যে কাজ করছিলাম। ৮।১০ দিনের মধ্যে সংগ্রাম সর্বাত্মক সাধারণ ধর্মঘটের চেহারা ধারণ করল। সূতাকলের এই সাধারণ ধর্মঘট ৬ মাস ধরে চলল। ধর্মঘটের মধ্যেই আমরা গড়ে তুললাম গিড়নি কামগড় ইউনিয়ন। ১৯২৮-এ তার সদস্য সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল ৮০ হাজারে। প্যারেলে তার একটা পাকাপোক্ত অফিস হল এবং একসার ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী বসে হাজার হাজার সভ্যের চাঁদা সংগ্রহ করতেন। সারা ভারতে এটিই ছিল কমিউনিস্ট নেতৃত্ব পরিচালিত সর্ববৃহৎ ইউনিয়ন" (এস এস মীরাজকর: সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ৩০ আগস্ট ১৯৭০)

## কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা

যোগেলেকর আরও বলেছেন: "এই ধর্মঘট পার্টির নেতৃত্বেই লড়া হয়েছিল। যদিও আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব ছিল যুক্ত ধর্মঘট কমিটির হাতে, সংগ্রামের মূল নীতি স্থির হত পার্টির কার্যকরী কমিটির প্রতিদিনের বৈঠক থেকে। পার্টি নিয়মিত নজর রাখত বলেই দুর্বলতার লক্ষণগুলিকে আমরা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে পেরেছিলাম। শ্রমিকদের মনোবল অটুট রেখে সংগ্রামে জয়যুক্ত হতে পেরেছিলাম।" (মীরাট মামলার নথিপত্র, পৃঃ ১৮৯০)

তৎকালীন সংবাদপত্রেও যে সমস্ত খবর বেরিয়েছে, তা থেকেও এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। ১৯২৮-এর ২ জুন বোম্বাই-এর সংবাদপত্র বড় শিরোনামায় খবর বেরল "বোম্বাইয়ের পুলিস ধর্মঘটের চরমপন্থী নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে।" অর্থাৎ গ্রেপ্তার হয়েছেন এস এ ডাঙ্গে এবং আর এস নিম্ব্কর। ৩ জুনের সংবাদপত্রে খবর বেরল যে মীরাজকর ধর্মঘটীদের সংগ্রামে দৃঢ় থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। ৪ জুন সংবাদপত্রে খবর বেরল যে নিম্ব্কর ছাড়া পেয়েছেন ও আপসের প্রস্তাবের দৃঢ় বিরোধিতা করেছেন। (টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, বোম্বাই, ২, ৩ ও ৪ জুন ১৯২৮)

ইংরেজদের সরকারি বর্ণনাও একই চিত্র আঁকছে : "বেশ কিছুদিন ধরেই কমিউনিস্টরা চেষ্টা করছে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে দখল করতে। তাদের সবচেয়ে বড় সাফল্য হল ১৯২৮-এ। সূতাকল শ্রমিকদের কোনও মজবুত সংগঠন ছিল না এবং এই দুর্বলতা সম্বন্ধে তারা সজাগও ছিল। তার সঙ্গে এল দীর্ঘদিনের ধর্মঘট। সব মিলিয়ে যে সুযোগ এল, তার সদ্ব্যবহার ও প্রচণ্ড পরিশ্রম করে কমিউনিস্ট শ্রমিকদের চিত্ত জয় করল এবং তাদের ৫০ হাজারকে একত্র করে এক মহা পরাক্রান্ত সংগঠন গড়ে তুলল।" (রয়্যাল কমিশন অফ লেবারের বিবরণী, জুন ১৯৩১, পৃঃ ৩১৯)

ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের একজন খ্যাতিমান, কমিউনিস্টবিরোধী ইতিহাসবিদও লিখেছেন : "কমিউনিস্টরা ধর্মঘটের নেতৃত্ব দখল করতে পেরেছিল কারণ তারা শ্রমিকদের মেজাজ ঠিকমত বুঝতে পেরেছিল এবং শ্রমিকদের দাবির সেরা সমর্থক হিসাবে জোরদার লড়াই করেছিল। তারাই প্রথম বুঝেছিল যে র‍্যাশনালাইজেশনের মৎলবকে বানচাল করতে হলে সাধারণ ধর্মঘটই একমাত্র অস্ত্র। কিন্তু তা বুঝবার পর, তাড়াহুড়ো করে শ্রমিকদের উপর ধর্মঘট চাপিয়ে দেবার চেষ্টা তারা করে নি। নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে তারা শ্রমিকদের বুঝতে দিল এবং যখন সাধারণ ধর্মঘটের জন্য শ্রমিকদের মন-মেজাজ তৈরী, একমাত্র তখনই তারা সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। ধর্মঘটের দীর্ঘ যুগে, তারা কখনই হঠকারি পদ্ধতি গ্রহণ করে নি। নরমপন্থী নেতাদের তারা সব সময়ে সঙ্গে ধরে রেখেছিল। তাছাড়া, স্বীকার করতেই হবে যে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করত, সম্পূর্ণ নির্ভীক এবং আদর্শের প্রতি গভীর নিষ্ঠাবান ছিল। এই গুণগুলি তাদের কাজে লেগেছিল এবং ধর্মঘটের অবসানের পর তারা বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীর অ-প্রতিদ্বন্দ্বী নেতায় পরিণত হল। সারা দেশে তাদের সম্মান বেড়ে গেল এবং অন্যান্য কেন্দ্রের শ্রমিকরাও তাদের নেতা বলে মানতে শুরু করল।" ( ভি বি কার্ণিক : স্ট্রাইকস্ ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৯২-৯৩ )

৬ মাস বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর ১৯২৮-এর ৪ অক্টোবর, যুক্ত ধর্মঘট কমিটি সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলেন। ধর্মঘটের মাসগুলিতে যুক্ত ধর্মঘট কমিটি ও গিড়নি কামগড় ইউনিয়ন, শ্রমিক ও জনসাধারণের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা চাঁদা তুলেছিল ও ১৪টি সাহায্যকেন্দ্র চালু রেখেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সূতাকল মজদুর ইউনিয়ন, ধর্মঘট কমিটিকে সৌভ্রাতৃত্বের চিহ্ন স্বরূপ ১০৫৯ পাউণ্ড ( প্রায় ১৬ হাজার টাকা ) সাহায্য পাঠিয়েছিল। এই টাকা দিয়ে ধর্মঘট কমিটি জাহাজ ভাড়া করে বহু শ্রমিককে তাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের একাংশও ধর্মঘটের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিঠলভাই প্যাটেল ও সরোজিনি নাইডুর নাম (লেবার মান্থলি, লণ্ডন, ১৯২৮, দশম খণ্ড, ১১নং সংখ্যা )।

ধর্মঘটের মূল কারণ ছিল অবশ্যই অর্থনৈতিক। কিন্তু ধর্মঘটী শ্রমিকরা অনিবার্যভাবেই রাজনীতির আবর্তে জড়িয়ে পড়ল। মীরাজকর বলেছেন : "এই ধর্মঘটের সময় শ্রমিক-ঐক্য ও শ্রমিক-সংহতির সপক্ষে বেশ খানিকটা প্রচার হল। আমরা শ্রমিকদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে শুধু দৈনন্দিন দাবী দাওয়ার জন্য লড়াই করাই যথেষ্ট নয়। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হতে হবে ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, মজুর-কৃষকদের রাজ গড়ার পথে অগ্রসর হওয়া। এই প্রচার তাদের মনে ধরল…আমাদের অর্থাৎ কমিউনিস্টদের এই সব কার্যকলাপ, ইংরেজ সরকার সতর্কভাবে লক্ষ্য করছিল এবং তারা এসব দেখে রীতিমতো ঘাবড়ে গেল।" ( এস এস মীরাজকর : স্মৃতিচারণ, মার্কসিস্ট মিসেলানি, দিল্লী, মার্চ ১৯৭৯, পৃঃ ১৪)।

## ধর্মঘটের বীরত্বপূর্ণ অবসান

৬ মাস বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ের পর সগর্বে মাথা উঁচু করে ধর্মঘটী সূতাকল মজুররা কাজে যোগ দিল। ১৯২৮-এর ৫ অক্টোবর বোম্বাইতে এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশ হল। সেখানে ভাষণ দিতে গিয়ে গিড়নি কামগড় ইউনিয়নের একজন নেতা বল্লেন : "গতকাল যে মিটমাট হয়েছে, তা যুদ্ধ বিরতি মাত্র। যতদিন তদন্ত কমিটির সুপারিশ না বের হয়, ততদিন লড়াই মূলতবী রইল" ( ডেইলি টেলিগ্রাফ, লণ্ডন, ৬ অক্টোবর ১৯২৮, লেবার মান্থলির পূর্বোদ্ধৃত সংখ্যায় পুনরুদ্ধৃত )।

১২ অক্টোবর গিড়নি কামগড় ইউনিয়ন শ্রমিকদের মধ্যে একটি ইস্তাহার বিলি করলেন। তাতে বলা ছিল : "সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট মুলতবী রয়েছে, তার অবসান হয়নি। আমরা যদি চুপচাপ বসে থাকি এবং তৈরী না হই, তাহলে সরকার ও মালিকরা আমাদের উপর আক্রমণ চালাবে।

সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য সমস্ত সূতাকল শ্রমিকদের প্রস্তুত থাকতে হবে। গিড়নি কামগড় ইউনিয়নের একলক্ষ সদস্য সংগ্রহ করতে হবে।" কার্ণিক : ষ্ট্রাইকস্ ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ১৯৯ )

সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট সারা ভারতে ধর্মঘটের তরঙ্গ বইয়ে দিল। জি আই পি রেল শ্রমিক এবং বোম্বের বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে শক্তিশালী কমিউনিস্ট পরিচালনাধীন ইউনিয়ন গড়ে উঠল। ১৯২৮-এর ১০ জুন সূতাকল ধর্মঘটের সমর্থনে বোম্বাইয়ের বন্দর শ্রমিকদের এক সমাবেশ আহূত হয়। বন্দর শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক ছিলেন এস এস মীরাজকর এবং তিনি বন্দর শ্রমিকদের আহ্বান জানালেন ধর্মঘটী সূতাকল শ্রমিকদের সক্রিয় সমর্থনে জানাতে। তাঁর সমর্থনে একই ধরণের বক্তৃতা করলেন শ্রমিক নেতা ঝাবওয়ালা, বেন্ ব্র্যাডলি প্রভৃতি ( টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া, ১১ জুন ১৯২৮ ) ১২ জুন জি আই পি রেল শ্রমিকরা ধর্মঘটের হুমকি দিল ( ঐ, ১৩ জুন ১৯২৮ )। ১৮ জুন জি আই পি রেল শ্রমিকদের এক বিশাল গণ-সমাবেশ থেকে ঝাবওয়ালার নেতৃত্বে এক ধর্মঘট পরিষদ নির্বাচিত হল। ( ঐ, ১৯ জুন, ১৯২৮ ) ১৯ জুন জি আই পি রেল শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের উপর নোটিশ জারি করল যে তারা ২৫ জুন থেকে সাধারণ ধর্মঘট করবে ( ঐ, ২০ জুন, ১৯২৮ ) ২২ জুন বি বি সি আই রেল শ্রমিকরাও সাধারণ ধর্মঘট করবে বলে ঘোষণা করল ( ঐ, ১৩ জুন, ১৯২৮ )।

## দক্ষিণ ভারতেও শ্রমিক বিক্ষোভ

ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভারতেও শ্রমিকরা অশান্ত হয়ে উঠল। দক্ষিণ ভারত রেল পথের কর্তৃপক্ষ, ১৯২৮ এর ২৮ জুন লক-আউট ঘোষণা করলেন, যাতে নাগাপট্টম, পোডামুর, গোল্ডেন রক ও ত্রিচিনপল্লির ৮ হাজার শ্রমিক আক্রান্ত হল। দক্ষিণ ভারতে রেল শ্রমিক ইউনিয়ন তখন সংস্কারবাদীদের হাতে ছিল। তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করল যাতে দক্ষিণ ভারতের রেল শ্রমিকরা সংগ্রামের পথে না যায়। তাদের একজন নেতা রেল শ্রমিকদের হুঁশিয়ার করে দিলেন, যাতে তারা কমিউনিস্টদের খপ্পরে না পড়ে। তা সত্ত্বেও জঙ্গী রেল শ্রমিকরা সংগ্রামের পথেই পা বাড়াল এবং কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে একটা ধর্মঘট কমিটি গঠন করে ঘোষণা করল যে তারা ১৯২৮-এর ২০ জুলাই থেকে সাধারণ ধর্মঘট করবে। দক্ষিণ

ভারতের রেল শ্রমিকদের এই সংগ্রামী ঘোষণা সারা ভারতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল ( লেবার মান্থলি, ১৯২৮, দশম খণ্ড, সংখ্যা ১০ )।

২০ জুলাই দক্ষিণ ভারতের রেল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট শুরু হল এবং প্রচণ্ড দমননীতি সত্ত্বেও, সাধারণ ধর্মঘট সফল হল। মায়াভরম, টিউটিকরিন ও ভিল্লুপুরমে পুলিস গুলি চালিয়ে ১২ জন রেল শ্রমিককে হত্যা করল, শত শত শ্রমিক আহত হল। গ্রেপ্তার হল বহু শত শ্রমিক এবং ধর্মঘট কমিটির প্রায় সমস্ত নেতা। দশদিন বীরত্বপূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট চালানর পর, প্রচণ্ড দমন-পীড়নের সামনে, পিছু হঠে, ৩০ জুলাই সাধারণ ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল। ( ঐ )

"মস্কোর" হাত

১৯২৮-এর জুন মাসের সংবাদপত্রসমূহের বিবরণী থেকে স্পষ্টই দেখা যায় যে শোলাপুর, কানপুর ও জামসেদপুরে একই ধরনের জবরদস্ত শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছিল এবং ইংরেজ সরকার, সবকটি ক্ষেত্রেই, ধর্মঘটের জন্য দায়ী করেছিল কমিউনিস্টদেরই। ( টাইমস অব ইণ্ডিয়া, ৯ জুন, ১৯২৮ )।

ভারতে ইংরেজ ধনকুবেরদের মুখপত্র, কলকাতার স্টেটসম্যান তাই আতঙ্কিত হয়ে লিখেছিল : "ভারতের শিল্পাঞ্চলে যে মস্কোর প্রতিনিধিরা কাজ করছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের ধর্মঘটের সমস্ত নেতারাই, সে তাঁরা ভারতীয় হ'ন বা না হ'ন, সকলেই প্রকাশ্য কমিউনিস্ট। সম্প্রতি তাঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং, চটকল ও সূতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট সংগঠিত করার কাজে যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেছেন।...মস্কোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।" ( স্টেটসম্যান, কলকাতা, ৩১ মে, ১৯২৮ )।

ইতিমধ্যে দেশজুড়ে শুরু হয়ে গেছে নতুন গণজাগরণ। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে চলেছে ভারতের সর্বত্র ব্যাপক প্রতিবাদ, কালো পতাকার মিছিল, হরতাল। ১৯২৮-এর ৩ ফেব্রুয়ারি, সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে পৌঁছয়, আর তার বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের রাজপথ কাঁপিয়ে বের হয় ৩০ হাজার শ্রমিকের জঙ্গী মিছিল। তাদের সংগঠিত করেছিল কমিউনিস্টরা ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদীরা, যাদের মুখে রণধ্বনি ছিল : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক। ( টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ )।

প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা সোহন সিং যোশ তখন যুবকর্মী। তিনি

বলছেন : "১৯২৮-এর গোড়াতেই পাঞ্জাবে আমরা গড়ে তুলেছি শ্রমিক ও কৃষক দল। ভগৎ সিং তখন বহু ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন। "কীর্তি" পত্রিকাটি আমরা একত্রেই বার করি। ভগৎ সিং তখন আমাকে বলতেন যে ইংরেজদের তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন করার পর, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়াই হবে তাঁদেরও কাম্য।" (সাক্ষাৎকার, দিল্লী, জুন, ১৯৭০)।

১৯২৮-এ ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই শ্রমিক ও কৃষক দল গড়ে ওঠে। বোম্বাই ও বাংলাদেশে তার অস্তিত্ব তো আরও পুরানো। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কমিউনিস্টরা স্থির করলেন যে ১৯২৮ এর ডিসেম্বরে, কলকাতায় যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হবে, তখনই তারাও সারা ভারত শ্রমিক ও কৃষকদলের প্রথম জাতীয় সম্মেলন করবেন।

## ঝরিয়াতে শ্রমিক মহাসম্মেলন

১৯২৮-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, বঙ্গ-বিহার সীমান্তের কয়লাখনি অঞ্চল ঝরিয়াতে, নিখিল ভারত ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হল। কমিউনিস্ট পরিচালিত গিড়নি কামগড় ইউনিয়ন এবং জি আই পি, রেলশ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা তখন যথাক্রমে ৮০ ও ৪০ হাজার। জওহরলাল নেহরু সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ইংরেজ সাম্যবাদী শ্রমিকনেতা জনষ্টন সম্মেলনে দৃপ্ত ভাষণ দিলেন। সম্মেলনের পর তাঁকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। জওহরলাল সহ সমস্ত প্রতিনিধিরা তখন বজ্রধ্বনি তোলেন : দুনিয়া কি মজদুর, একহো! এই সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত হয় যে নিখিল ভারত ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংঘর অন্তর্ভুক্ত হবেন। (গৌতম চট্টোপাধ্যায়, কমিউনিজম এ্যাণ্ড বেঙ্গলস্' ফ্রীডম মুভমেণ্ট, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১৬)।

শ্রমিক ও কৃষক দলের সারা ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতায়, ২১ থেকে ২৪ ডিসেম্বর। পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট নেতা সর্দার সোহন সিং যোশ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন। উপস্থিত সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাই থেকে মীরজাকর, ঘাটে, যোগলেকর ও নিম্বকর, উত্তরপ্রদেশ থেকে পি সি যোশী, বাংলাদেশ থেকে মুজফফর আহমদ, আবদুর রেজ্জাক খাঁ,

গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী প্রভৃতি। (সোহন সিং যোশ : সাক্ষাৎকার, দিল্লী, ১৯৭০)।

ঐ বছরই ২৭ডিসেম্বর, কলকাতার রামমোহন হলে সারা ভারত সমাজতন্ত্রী যুবকদের প্রথম মহাসম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জওহরলাল নেহরু। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ভাষণে বলেন : "যে সব যুবকরা মার্কসবাদী, তাঁদের কর্তব্য ভারতীয় পরিস্থিতির সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা করা ও তাদের শ্রেণী সচেতন করা" (ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টারলি রেজিষ্টার, কলকাতা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯২৮, পৃঃ ৪৫৩)।

## কলকাতা কংগ্রেসে শ্রমিক মিছিল

অবশ্য ১৯`৮-এর ডিসেম্বর মাসের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা ঘটে কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন চলাকালে। এমনিতেই এই অধিবেশনে প্রবল উত্তেজনা ছিল। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের রক্ষণশীল নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যকে "ডোমিনিয়ন স্টেটাস"-এর মধ্যে সীমিত রাখতে চাইছিলেন। আর দেশের তারুণ্য ও বামপন্থী শক্তিরা জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সংশোধনী এনেছিলেন যে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হবে পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রবল বিতর্কের পর সামান্য ভোটের ব্যবধানে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পরাজিত হয়। তার পরের দিন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ৫০ হাজার শ্রমিকের এক দৃপ্ত মিছিল কংগ্রেস অধিবেশনের সামনে আসে, মণ্ডপে প্রবেশ করে ও জাতীয় নেতৃত্বের কাছে নিজেদের দাবী পেশ করে। এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন রাধারমন মিত্র, বঙ্কিম মুখার্জী, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, শিবনাথ ব্যানার্জী প্রমুখ। জাতীয় কংগ্রেসের সরকারি ইতিহাসবিদ লিখছেন : "কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন ৫০ হাজার শ্রমিকের এক সুশৃঙ্খল মিছিলের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারা দুই ঘন্টার জন্য মণ্ডপ দখল করে, জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানিয়ে, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। (পট্টভি-সীতারামাইয়া: হিষ্ট্রি অফ দি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৩২)।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ এবার সত্যই আতঙ্কিত হল। বড়লাট আরউইন স্বয়ং বল্লেন : "কিছুদিন ধরে ভারতে কমিউনিজমের অস্বস্তিকর প্রভাব বৃদ্ধি

আমাদের সরকারের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।" (কেন্দ্রীয় আইন সভার বিবরণী, ২৮ জানুয়ারি, ১৯২৯)।

বহুদূর থেকে মানবেন্দ্রনাথ রায়ও হুঁশিয়ারি দিলেন: "সাম্রাজ্যবাদ নির্ভুলভাবেই তার সবচেয়ে মারাত্মক ও দৃঢ়চেতা শত্রুকে চিনতে পেরেছে—সে শত্রু ভারতের সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী" (ইনপ্রেকর, ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯)।

ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ও বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়াল।

ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকদের বিরাট মিছিল ১৯২৮-এর কংগ্রেস অধিবেশনে এসে এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সেই চটকল শ্রমিক, তাদের লড়াই ও সংগঠনের কথা একটু বলা দরকার। উনিশ শতকের শেষ থেকেই চটকল শ্রমিকরা মাঝে মাঝেই ধর্মঘট করেছে, বিশেষতঃ ২৪ পরগনায় ও হাওড়ায়—বজবজে, টিটাগড়ে, কামারহাটিতে, কাঁকিনাড়ায় এবং চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়াতে। মজুরি বৃদ্ধি, পূজো-পার্বনে ছুটির দাবী ও সাহেব কর্মচারিদের জুলুমের প্রতিবাদই এইসব ধর্মঘটের মূল কারণ ছিল। ১৮৯৫-এর জুন মাসের শেষের দিকে বজবজে চটকলে এমনি এক ধর্মঘটের জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছে "অমৃতবাজার পত্রিকা"।

সেখানে লেখা হয় যে "গত মঙ্গলবার রাত ৮টা নাগাদ বজবজে গুরুতর গণ্ডগোল হয়েছে। বজবজের চটকলের প্রায় ৭ হাজার শ্রমিক, সাহেব বড়-কর্তাদের বাংলো ঘিরে ফেলে। তাদের দাবী ছিল যে তাদের সর্দারটি অত্যন্ত অত্যাচারী, তাকে বরখাস্ত করতে হবে। মালিকরা দাবী মানতে অস্বীকার করলে শ্রমিকরা তাদের বাসস্থান ঘেরাও করে। সাহেব মালিকরা তখন গুলি চালায় এবং দুজন শ্রমিক গুরুতর আহত হয়। ক্রুদ্ধ জনতাও তখন মিলের দারোয়ান ও পুলিশদের আক্রমণ করে। বেশ কয়েকজন শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬ জুন ১৮৯৫)

ঐ একই সময়ে অন্য একটি সরকারি রিপোর্ট থেকেও চটকলে শ্রমিক অসন্তোষের ছবি বেরিয়ে আসে। সেখানে লেখা হয়েছে: "মজুরি বৃদ্ধির দাবীতে ২৪ পরগনার বেশ কয়েকটি চটকলে অশান্তি দেখা দিয়েছে। ধর্মঘট হয়েছে টিটাগড়ে, কামারহাটিতে, কাঁকিনাড়ায়—একাধিক চটকলে।" (বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট, ১৮৯৫-৯৬)

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের সময়, চটকলের শ্রমিকরাও নতুন সাহস সঞ্চয় করে সংগ্রামের ময়দানে নামল। "১৯০৬-এ ক্লাইভ জুটমিলে ধর্মঘট হল, ৪ হাজার শ্রমিক দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই চালাল। অশ্বিনী ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এই ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠল একটি চটকল মজদুর ইউনিয়ন।" (রেইমনার ও গোল্ডবার্গ সম্পাদিত "তিলক অ্যাণ্ড দি স্ট্রাগল্ ফর ইণ্ডিয়ান ফ্রীডম", দিল্লী, ১৯৬৬, পৃঃ ২৭৫)।

১৯২১-২২-এ অসহযোগ খিলাফৎ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘটের ঢেউ জেগেছিল। ভারতে ধর্মঘট সংগ্রামের একজন ইতিহাসবিদ লিখছেন যে ১৯২১-এ বাংলার চটকলগুলিতে ৩৮টি ও ১৯২২-এ ৪১টি ধর্মঘট হয়েছিল। এর মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ধর্মঘটে শ্রমিকরা আংশিকভাবে জয়লাভ করতেও সক্ষম হয়েছিল। (কার্ণিক: স্ট্রাইক্স্ ইন ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৭০)

এই যুগে জাতীয় আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে একজন প্রবীণ শ্রমিক নেতা লিখছেন: চটকল শ্রমিকরাও পেছিয়ে রইল না। জাতীয় আন্দোলনে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল। ১৯২২ সালে টিটাগড়ে সমস্ত চটকলে ধর্মঘট হল। তাদের ক্রোধের আগুনে মালিকের গুদাম ভস্মীভূত হল। ছুটে গেলেন গান্ধীজি তাদের ভিতরে, তিলক ফাণ্ডে চাঁদা আদায়ের জন্য। অনশনক্লিষ্ট শ্রমিকরা চাঁদা করে ২২ হাজার টাকা দান করল। পরিবর্তে গান্ধীজি তাদের ধর্মঘট পরিহার করে স্বরাজের জন্য অপেক্ষা করতে উপদেশ দিলেন। এর পরেই হল বালীর চটকলে ধর্মঘট। পুলিসের গুলি চলল, কয়েকজন শ্রমিক প্রাণ হারাল। ছুটে গেলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাদের মধ্যে। মালিকের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে, তিনিও লড়াই পরিচালনার পরিবর্তে তা পরিহার করলেন। পরের বছর ১৯২৩-এ ধর্মঘট হল রাণীগঞ্জ ও সাঁকরাইলে।......এখানেও গুলি চলল, কয়েকজন হতাহত হল শেষে নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হওয়ায় ধর্মঘট ভেঙে গেল।" (আবদুল মোমিন: চটকল শ্রমিকদের প্রথম সাধারণ ধর্মঘট, ১৯২৯, কালান্তর, ১০ ৮।৭০)

১৯২৮-এর চটকল ধর্মঘট সম্বন্ধে মোমিন লিখছেন:

"১৯২৮ সালে চেঙ্গাইল লাডলো জুট মিলে গণ্ডগোল শুরু হয়। সেখানকার জওয়াল সর্দার ছিল দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। তার অত্যাচারে শ্রমিকরা

অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে বেতন বৃদ্ধি না হলেও দিনাতিপাত করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। এহেন অবস্থায় শ্রমিকরা সুবেদ আলি, আকবর আলি, অশ্বিনী দাসের নেতৃত্বে সেখানে ধর্মঘট করে বসল। ছুটে এল তারা ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টির অফিসে। খবর পাওয়া মাত্র সেখানে ছুটে গেলেন ফিলিপ স্প্র্যাট, গোপেন চক্রবর্তী, বঙ্কিম মুখার্জি, রাধারমণ মিত্র, আরও অনেকে। ধর্মঘট চলল এবং কয়েকদিনের ভিতরেই তা সাফল্যমণ্ডিত হল। মালিকরা শ্রমিকের দাবী মেনে নিল। চটকল শ্রমিকের ইতিহাসে এটিই হল প্রথম সফল সংগ্রাম।" (মোমিন: ঐ)

রাধারমণ মিত্রও বলছেন: "১৯২৮-এ বাংলাদেশের সমস্ত ধরনের শ্রমিকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিল। চেঙ্গাইলেই আমি প্রথম সংগঠিত করি বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। ধর্মঘট শুরু হয়ে যায় চেঙ্গাইলে, সাহেব মালিকরা ভয় দেখিয়ে সেই শ্রমিক ধর্মঘট ভাঙার চেষ্টা করে। একলা সংগঠক হিসাবে আমি সব দিক সামলাতে পারছিলাম না। তাই ফিলিপ স্প্র্যাটকে আমিই নিয়ে আসি চেঙ্গাইলে" (রাধারমণ মিত্র: সাক্ষাৎকার, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ এবং গৌতম চট্টোপাধ্যায়: কমিউনিজম্ অ্যাণ্ড বেঙ্গলস ফ্রীডম মুভমেন্ট, পৃ: ১৪৫) ফিলিপ স্প্র্যাটও লিখছেন: "চেঙ্গাইলে ধর্মঘটের প্রধান সংগঠক ছিলেন রাধারমণ। গোপেনও বোধহয় যেতেন, ঠিক মনে নেই। আমার কথা শ্রমিকরা কতটা বুঝত তা জানি না। তবে সাদা চামড়ার মালিকের বিরুদ্ধে, মুঠো পাকিয়ে আর একজন সাদা চামড়ারই লোক মজুরদের পাশে দাঁড়িয়েছে, এটার বোধহয় খানিকটা মূল্য ছিল।" (স্প্র্যাট: গৌতম চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি ২৩।৫।৭০)

চেঙ্গাইলের পর ধর্মঘট হল বাউড়িয়া ফোর্ট গ্লাস্টার জুট মিলে, সেখানে ৩টি মিলে ডবল শিফ্‌টে কাজ করতেন ২২ হাজার শ্রমিক। মালিকরা স্থির করল ডবল শিফ্‌ট চালাবে না, ছাঁটাই করবে ৬ হাজার শ্রমিককে। শ্রমিকরা ধর্মঘট করল, সে কঠোর লড়াই চলল ৬ মাস ধরে। রাধারমণ মিত্র, বঙ্কিম মুখার্জি, স্প্র্যাট, কিশোরীলাল ঘোষ প্রভৃতি তার নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। বহু শ্রমিক জেলে গেল, কিন্তু মিল খুলল না। মোমিন এর দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে লিখছেন "এই দুটি ধর্মঘটে মালিকরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ে, সরকারও বিচলিত হয়ে ওঠে।" (ঐ)

কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের পর জওহরলাল নেহরু ধর্মঘটের নেতাদের

সঙ্গে বাউড়িয়া যান ও ফিরে এসে তাদের সমর্থনে এক বিবৃতিতে বলেন: "বাউড়িয়াতে আজ চটকলের গরীব শ্রমিক ও বাংলার চটকলের সম্রাটদের মধ্যে এক মরণপণ সংগ্রাম চলছে। শ্রমিকদের নিত্য সঙ্গী হচ্ছে অনাহার, অর্ধনগ্নতা ও প্রচণ্ড অভাব। চটকলের বাদশাদের আছে অঢেল অর্থ, সীমাহীন মুনাফা এবং সরকার তাদের বন্ধু। পাল্লা মজুরদের বিরুদ্ধেই হেলে আছে, কিন্তু কি অপরিসীম বীরত্বের সঙ্গেই না তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।··· আমরা, দেশবাসী এখন পর্যন্ত এ সংগ্রামে কি করেছি? আমরা কি মুখ বুঝে দেখে যাব যে চটকলের বাদশারা, সরকারের সাহায্যে শ্রমিকদের সংগ্রামকে চুরমার করে দেবে? এ সংগ্রাম শুধু বাউড়িয়া চটকল মজুরদের সংগ্রাম নয়, এটা সারা ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সংগ্রাম। যাঁরাই মনে করছেন যে বাউড়িয়ার শ্রমিকদের লড়াই ন্যায়বিচারের জন্য, তাদেরই কর্তব্য সর্বশক্তি দিয়ে তাদের সংগ্রামকে সাহায্য করা" ( অমৃতবাজার পত্রিকা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯ )

১৯২৮-এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের অধিবেশন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তখন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের মতবিরোধ দেখা দিতে শুরু করেছে, তবে তিনি তখনও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করেন নি। তবে ভারতবর্ষ থেকে আরও তিনজন প্রতিনিধি ষষ্ঠ কংগ্রেসে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন—শউকৎ উসমানি (সিকান্দার শূর ছদ্মনামে) সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (নারায়ণ ছদ্মনামে) এবং জি এ লুহানি। তাছাড়া ভারতের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন বিলেতের কমিউনিস্ট নেতা ক্লিমেন্স পাম দত্ত (আর পি ডি-র ভাই)। এই সব মতামতগুলিও কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, সেই যুগে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বোঝার জন্য একান্তভাবেই প্রাসঙ্গিক।

ক্লিমেন্স পাম দত্তর দীর্ঘ প্রবন্ধ (ইণ্ডিয়া'জ পার্ট ইন ওয়ার্ল্ড রিভ্যলুশন) পড়লে স্পষ্টই বোঝা যে গভীর পাণ্ডিত্য ও ভারত সম্বন্ধে বৈপ্লবিক চেতনা থাকা সত্ত্বেও, ১৯২৮-এ ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়নে তিনি অনেকখানিই ব্যর্থ। যেমন তিনি লিখছেন: ভারতে তাদের রাষ্ট্রক্ষমতাকে দায়িত্ব দিতে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সফল হয়েছে···কিছুটা শাসন সংস্কার করে ভারতীয় বুর্জোয়াদের উপরতলার হাতে তারা সীমাবদ্ধ ক্ষমতা

দিয়ে, তাদের দলে টেনেছে…।" (জি অধিকারী সম্পাদিত): ডকুমেন্টস্ অব দি হিস্ট্রি অব সি পি আই, তৃতীয় খণ্ড সি, ১৯২৮, পৃঃ ৪৯৪)। আবার একটু পরে তিনি লিখছেন: "কৃষি সঙ্কট যদিও ক্রমেই তীব্র হচ্ছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে চাষীদের মধ্যে যে ধরনের গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল, তার কোনও চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।" (ঐ পৃঃ ৪৯৯)

## কমিণ্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস

১৯২৮-এর জুলাই-আগস্ট মাসে প্রবন্ধ রচনা করছেন সি পি দত্ত, অথচ তখন সাইমন-বিরোধী জঙ্গী মিছিলে সমস্ত ভারতবর্ষ উত্তাল, বোম্বাই ও বাংলাতে সূতাকল, চটকল ও রেল শ্রমিকদের রক্তাক্ত ধর্মঘট চলছে, ভারতের নানাপ্রান্তে চাষীরা শুরু করছে খাজনা মকুবের ও বাড়তি ট্যাক্স বিরোধিতার সংগ্রাম। ১৯২৮-এর শেষে কলকাতা কংগ্রেসের সংগ্রামী মেজাজ আমরা ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। ক্লিমেন্স পাম দত্তের লেখায় ভারতের সেই সংগ্রামী প্রতিচ্ছবি ও তার বৈপ্লবিক বিশ্লেষণ খুঁজে পাওয়া মুসকিল।

অবশ্য দত্তকে শুধু দোষ দিলে চলবে না। কমিন্টার্নে'র অন্যতম কর্ণধার, যোশেফ স্ট্যালিনের তৎকালীন দক্ষিণহস্ত অটো কুসেনিন, ষষ্ঠ কংগ্রেসের মূল ঔপনিবেশিক থিসিসটি পেশ করতে গিয়ে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের দোদুল্যমান চরিত্রকে কার্যতঃ অস্বীকার করেন, অস্বীকার করেন তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকার দিকটিকে। জোর দেন তাদের শ্রমিক-বিরোধী, বিপ্লব-বিরোধী দিকের উপর (কুসেনিন: দি রেভল্যুশনারি মুভমেন্ট ইন দি কলোনিজ, ইনপ্রেকর, ৪ অক্টোবর ১৯২৮)।

কমিন্টার্নে'র ষষ্ঠ কংগ্রেসে শেষপর্যন্ত যে ঔপনিবেশিক থিসিসটি গৃহীত হয়, তাতে সাফ বলে দেওয়া থাকে যে "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি যেন জাতীয়-বুর্জোয়াদের সঙ্গে কোনও যুক্ত মোর্চা গঠন না করে" এবং শুধু তাই নয় "খুব স্পষ্টভাবেই যেন পার্টি নিজেকে তফাৎ করে রাখে সমস্ত পেটি-বুর্জোয়া দলসমূহ ও গোষ্ঠীবর্গ থেকেও।" (থিসিস অন দি রেভ্যুল্যশনারি মনুমেন্ট ইন দি কলোনিজ অ্যাণ্ড সেমি-কলোনিজ, ইনপ্রেকর, ১২ ডিসেম্বর, ১৯২৮)।

ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি শউকৎ উসমানি আরও কয়েক ডিগ্রী বাঁয়ে সরে গিয়ে বল্লেন যে ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস পার্টি নামে যে জগাখিচুড়ি

ভারতের কমিউনিস্টরা বামপন্থী যুক্তফ্রন্টের নামে গড়ে তুলেছে, তা অবিলম্বে ভেঙে দেওয়া উচিত। (ইনপ্রেকর, ৮ নভেম্বর, ১৯২৮)

ক্লিমেন্স দত্ত অবশ্য অতদূর যেতে রাজী ছিলেন না। তিনি ভারত-জুড়ে আইনসঙ্গত ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস পার্টি গড়ে তোলার রণকৌশলের প্রশংসাই করলেন (ইনপ্রেকর, ৩০ অক্টোবর, ১৯২৮)

## পরিস্থিতির মূল্যায়নে নানান মতামত

স্বীকার করতেই হবে, যে কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে এ ব্যাপারে বেশ খানিকটা ভিন্ন সুরে বক্তৃতা করেছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বলেছিলেন : "উপনিবেশসমূহে পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের, শহরের পেটিবুর্জোয়াদের একটা বিপ্লবী ভূমিকা রয়েছে। সেই সব সংগ্রামী পেটিবুর্জোয়াদের সঙ্গে আমাদের ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চার সাংগাঠনিক চেহারা কি হবে?...ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র উচিত পেটি-বুর্জোয়াদের এই বিপ্লবী উৎসাহকে কাজে লাগানো। আমার স্পষ্ট মতা-মত এই যে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চা গড়তে হলে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টিকে শক্তিশালী করতে হবে এবং সর্বহারার নেতৃত্বে শহুরে বুদ্ধিজীবী সহ সমস্ত সংগ্রামী পেটিবুর্জোয়াকে এক ঐক্যবদ্ধ সংগঠন গড়তে হবে।" (ইনপ্রেকর : ৩০ অক্টোবর, ১৯২৮)

ভারতের স্বল্পসংখ্যক কমিউনিস্টদের কাছে কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের দলিলপত্র প্রথম পৌঁছে দেন জার্মানি ফেরৎ তরুণ বিজ্ঞানী ও পরে কমিউনিস্ট নেতা ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী। (সাক্ষাৎকার : নভেম্বর ১৯৭৫, অজয় ভবন) সে যুগের তরুণ কমিউনিস্টরা কায়মনোবাক্যে আন্তর্জাতিকতাবাদী ছিলেন কমিন্টার্নের প্রতি আনুগত্যও তাঁদের কারুর চেয়ে কম ছিল না। তবু তাঁদের তারিফ করতে হয়, যে কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের এই রকম মারাত্মক বিভ্রান্তিকর ও সঙ্কীর্ণতাদোষদুষ্ট থিসিস হাতে পাওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাদের ভারতের গণসংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে ব্যবহার করে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলনে (কলকাতা ডিসেম্বর ১৯২৮) যে মূল থিসিস গ্রহণ করলেন, তা কমিন্টার্ন নেতৃত্বের থিসিসের চেয়ে অনেক বেশী সঙ্কীর্ণতাদোষমুক্ত এবং বাস্তব পরিস্থিতির অপেক্ষাকৃত সঠিক মূল্যায়ন।

## ওয়ার্কাস-পেজান্টস দলের থিসিস

তাঁদের গৃহীত থিসিসে বলা হল : "এখন বেশ কিছুকাল ধরে কংগ্রেস থাকবে একটি ঢিলেঢালা সংগঠন, যার আদর্শও থাকবে বেশ অস্পষ্ট। বুর্জোয়া নেতৃত্বেই তা পরিচালিত, কিন্তু তার সমর্থকবৃন্দের বৃহৎ অংশই পেটি-বুর্জোয়া। এই সমর্থকরা এসেছেন সমাজের নানান স্তর থেকে, তাঁদের রয়েছে নানান রকম রাজনৈতিক প্রবণতা, যাঁদের মধ্যে একাংশের আছে বিপ্লবী সম্ভাবনা এই যখন বাস্তব অবস্থা, এবং সারা দেশ জুড়ে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি যখন এখনও যথেষ্ট দুর্বল ও অসংগঠিত, তখন সঠিক রণকৌশল হবে কংগ্রেসের ভিতরে ঢুকে বিপ্লবী গোষ্ঠী তৈরী করা, বিপ্লবী প্রচার করা, কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের মুখোস খুলে দেওয়া এবং তাদের বিপ্লবী অংশদের ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টির দিকে আকর্ষণ করা..." (থিসিস অব দি ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি অব ইণ্ডিয়া, লেবার মান্থলি, লণ্ডন, মার্চ ১৯২৯)।

ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বও এই মূল্যায়নকে তারিফ করে লিখলেন : "ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়নের জন্যই শুধু এই থিসিসটি গুরুত্বপূর্ণ, তা পার্টির নীতি ও কর্মসূচীর দায়িত্বশীল ব্যাখ্যার জন্যই এটি তাৎপর্যপূর্ণ" (দি পলিটিক্যাল সিচুয়েশন ইন ইণ্ডিয়া, লেবার মান্থলি, মার্চ ১৯২৯)

আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, তাঁর মতপার্থক্য সত্ত্বেও, কলকাতার এই সম্মেলনের উপর কমিণ্টার্নেরই মুখপত্রে মানবেন্দ্রনাথ রায়ও লিখলেন :

"ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী পরিবেশের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টির সর্বভারতীয় সম্মেলন, যে দলের চালিকাশক্তি হচ্ছে ভারতের কমিউনিস্টরাই। ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টিটি নিশ্চয় কমিউনিস্ট পার্টি নয়। কিন্তু কমিউনিস্টরাই রয়েছেন তার নেতৃত্বের আসনে। জাতীয়তাবাদী জনগণের প্রগতিশীল রূপান্তরে সেতুবন্ধের কাজ করার জন্যই এ দলের জন্ম। তাই কমিউনিস্টরা একে সর্বদা মদৎ দিয়েছে। গত দু বছরের প্রায় সমস্ত বড় বড় শ্রমিক ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছে এই দলটিই। কমিউনিস্টদের লক্ষ্য হচ্ছে এই দলের মঞ্চে জাতীয়তাবাদী শিবিরের সমস্ত বিপ্লবীদের জমায়েত করা, দলটিকে একটি জাতীয় বিপ্লবী গণপার্টিতে পরিণত করা—যা এই মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন।" (এম এন রায় : দি

কনফারেন্স অফ দি ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি অব ইণ্ডিয়া, ইনপ্রেকর, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯)

এইসব কিছু থেকে আজ আর একটি কথাও স্পষ্ট হয়। তা এই যে, কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সময়ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী পরিস্থিতি ও রণকৌশলের মূল্যায়ন নিয়ে মতভেদের অবকাশ ও সুযোগ দুইই ছিল। ভারতের কমিউনিস্টদের মতামত, ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের মতামত ও রায়ের প্রবন্ধ তারই নির্ভুল প্রমাণ। এ থেকে আরও বোঝা যায় যে ভারতের কমিউনিস্টরা, তাঁদের সেই কৈশোরে, একনিষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়েও, বাস্তবে অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে বিচার করা নিজেদের স্বাধীন বুদ্ধিকে কোনও সময়ই কোথাও বন্ধক দিয়ে দেন নি।

১৯২৯-এর জানুয়ারি মাসে সাইমন কমিশনের কলকাতায় আসার কথা। জাতীয়তাবাদী মহলে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেস মণ্ডপে যখন কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বিশাল শ্রমিক মিছিল এসেছিল, তখন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান হিসেবে সুভাষচন্দ্র বসু মোটেই খুসী হয় নি। বাধা দিয়েছিলেন শ্রমিক শোভা-যাত্রীদের। পরে মতিলাল নেহরুর নির্দেশে মিছিলকে তিনি মণ্ডপে ঢুকতে দেন। কিন্তু শ্রমিক আন্দোলনের সেই সংগঠিত শক্তি তাঁর মনেও ছাপ রেখে গিয়েছিল। ফলে ১৯২৯-এর জানুয়ারি মাসে তিনি দৌড়লেন শ্রমিক নেতাদের কাছে। সুভাষচন্দ্রের বিশ্বস্ত সহকর্মী, সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তখন কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা সচিব। তাঁর পুরানো বন্ধু হচ্ছেন অন্যতম শ্রমিক নেতা রাধারমণ মিত্র। তাঁর মারফৎ রাধারমণ মিত্রর সঙ্গে যোগাযোগ করলেন সুভাষচন্দ্র। প্রস্তাব করলেন সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও শ্রমিক সংগঠনের যুক্ত হরতাল ও যুক্ত মিছিল হোক। রাজী হলেন রাধারমণ, বঙ্কিম মুখার্জী ও অন্যান্যরা। সর্ত হল ইস্তাহারে কংগ্রেস ও শ্রমিক সংগঠন উভয়েরই নাম থাকবে।

রাধারমন মিত্র বলছেন: "ইস্তাহারের বাণ্ডিল যখন ছেপে কংগ্রেস অফিস থেকে আমাদের কাছে এল, তখন খুলে দেখি যে সেটার তলায় শুধু কংগ্রেস কমিটির নাম আমাদের সংগঠনের নাম নেই। সোজা বাণ্ডিল-গুলো ফেরৎ দিলাম কংগ্রেস অফিসে। তখন সুভাষচন্দ্র বল্লেন: ভাই

রাগ কোর না, ভুল হয়ে গেছে, তোমাদেরও নাম দিয়ে আবার ছেপে দিচ্ছি। আসলে ওঁরা তো শ্রমিকদের কথা বিশেষ ভাবতেন না, তাই তাদের নামটাও বাদ গিয়েছিল।" (রাধারমণ মিত্র, সাক্ষাৎকার, ১৯৭৯)।

## কলকাতায় সাইমন বিরোধী মিছিল

যাই হোক, শেষ অবধি যুক্ত প্রতিবাদই হল। ১৯২৯-এর ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় সাইমন কমিশন যেদিন এল, সেদিন পূর্ণ হরতাল হল আর লক্ষ মানুষের কালো পতাকার মিছিল। মুখে রণধ্বনি "সাইমন, ফিরে যাও।" ইংরেজদের মুখপত্র সভয়ে লিখল "কলকাতায় সাইমন বিরোধী মিছিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লাল ঝাণ্ডা হাতে হাজার শ্রমিকের তাতে যোগদান। সংখ্যায় তারা সমগ্র মিছিলের অর্ধেক তো বটেই" (স্টেটসম্যান, ২০ জানুয়ারি, ১৯২৯)।

প্রবীণ কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতা সোমনাথ লাহিড়ী এই মিছিলে ছিলেন। তিনি আমাদের বলেছিলেন যে "সাইমন ফিরে যাও" বলে কলকাতার ট্রাম শ্রমিকরাও ধর্মঘট করেছিলেন। কালীঘাট ট্রাম ডিপোর সামনে ট্রাম গাড়ীর পথ আটকে, ট্রাম লাইনের উপর সেদিন শুয়ে পড়েছিলেন কয়েকশত জঙ্গী ট্রাম শ্রমিক। বদলা নিয়ে সাহেব মালিকরা সেদিন ছাঁটাই করেছিল বেশ কয়েকজন জঙ্গী ট্রাম শ্রমিককে। কিন্তু ভাঙতে পারেনি সাইমন বিরোধী শ্রমিক ধর্মঘটকে। (সোমনাথ লাহিড়ী, সাক্ষাৎকার, অক্টোবর ১৯৬৭)।

১৯২৮-এর একেবারে শেষেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির এক গোপন বৈঠকও হয়। সভাপতিত্ব করেন মুজফ্‌ফর আহমদ। সেখান থেকে নির্বাচিত হয় ১০ জনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতি। তার সভ্য হন বোম্বাই থেকে ৫ জন—মীরাজকর, ডাঙ্গে, ঘাটে, নিম্ব্‌কর ও যোগলেকর; কলকাতা থেকে ৩জন—মুজফ্ফার আহমদ, আবদুল হালিম ও সামসুল হুদা; পাঞ্জাব থেকে ২জন—আবদুল মজিদ ও সোহন সিং যোশ। উত্তর প্রদেশ থেকে পি সি যোশীকে কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতিতে নেওয়ার প্রস্তাবে মতৈক্য হয় না। সদ্য জার্মানী ফেরৎ গঙ্গাধর অধিকারীকে পার্টির সদস্য পদ দেবার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন কে এন যোগলেকর এবং সাধারণ সম্পাদক এস ভি ঘাটে। সভায় আরও দুটি সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতি মাসে একবার করে কার্যকরী কমিটির সভা ডাকতে হবে এবং বোম্বাই হবে

পার্টির সদর দপ্তর। তাছাড়া স্থির হয় যে পার্টি কমিন্টার্নের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য আবেদন করবে। (মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্র, নং পি ১২৯৫)

## কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তাহার

১৯২৯-এর গোড়াতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নামে ভারতের শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। তাতে লেখা হয়:

"শ্রমিকশ্রেণী এখন যে যুগে প্রবেশ করছে, তা দুঃখকষ্টের, প্রচণ্ড বিপদের ও বিপুল সম্ভাবনার যুগ। শ্রেণী হিসেবে শ্রমিকরা যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলেই একমাত্র তারা বহু বছরের দাসত্ব ও দুর্গতিকে এড়াতে পারবে। গত কয়েকমাস ধরে দমনপীড়নের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে বিরাট বিরাট রাজনৈতিক ধর্মঘট ও মিছিল হয়েছে, তা প্রমাণ করছে যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামও এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে। আফগানিস্তান, চীন, আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে যেসব খবর আসছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে ভবিষ্যতে একটা বিশ্ব যুদ্ধের বিপদ ঘনিয়ে আসছে। সম্ভবত সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা শ্রমিকদের গড়া রুশ প্রজাতন্ত্রকে আক্রমণ করবে। অথবা একদল সাম্রাজ্যবাদী আর একদল সাম্রাজ্যবাদীরা সঙ্গে যুদ্ধ করবে, নৃশংসভাবে গণহত্যা করা হবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে যুদ্ধের নামে…।

শ্রমিকশ্রেণীকেই এই বিপদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। সভ্যতার এই দ্রুত অধঃপতনকে রুখতে পারে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর সংহত শক্তিই। বুর্জোয়ারা সমস্ত গণ্ডগোল ও 'অশান্তি'র জন্য দায়ী করে কমিউনিজমকে। আমরা এর জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই, কারণ এর ফলে শ্রমজীবীরা আরও ভাল করে বুঝতে পারে যে কমিউনিজমই তাদের মুক্তির প্রকৃষ্ট আদর্শ," (মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার নথিপত্র, পি ৫২৭/৮)

ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের শৈশবের ইতিহাসের নামে শত্রু-মিত্র অনেকেই অনেক কথা বলেছেন। এই সব প্রামাণ্য তথ্যের আলোকে অনেক বিরূপ মন্তব্যই গালগল্প বলে প্রমাণিত হয়। বার বার একটা কথা স্পষ্ট হয়—সেই আদিযুগেও মুষ্টিমেয় কমিউনিস্ট সংগঠকদের শ্রেণী চেতনা যথেষ্ট প্রখর ছিল, বৈপ্লবিক দেশপ্রেম ছিল গভীর এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের পথ থেকে তাঁরা সহজে বিচ্যুত হননি ১৯২৯-এর উদ্ধৃত ইস্তাহারটি সেই রকমই একটি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ।

## সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র

আগেই আমরা দেখেছি যে বড়লাট আরউইন ভারতে সাম্যবাদী আদর্শের প্রসার দেখে কেন্দ্রীয় আইনসভায় কিরকম উদ্বেগ দেখিয়েছিলেন। ভারতে বৃটিশ পুঁজির মুখপত্র স্টেটসম্যান তো "মস্কোর" বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাই করতে চেয়েছিল। সুতরাং ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে সলা পরামর্শ শুরু হয়ে গেল যে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। একটা মত হল যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনী ঘোষণা কর, শ্বাস রোধ কর শ্রমিক আন্দোলনের। কিন্তু তাহলে ইংলণ্ডের শ্রমিক দল বড়ই হৈ চৈ বাধিয়ে দেবে। অতএব অন্য পথ চাই। পরামর্শ এল যে কমিউনিস্টদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে একটা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু কর। কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন কর কংগ্রেস পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন থেকে এবং বিচ্ছিন্ন কোণঠাসা অবস্থায় তাদের ধ্বংস কর।

১৯২৯-এর গোড়া থেকেই ভারতের বড়লাট আরউইন, এদেশের বড় বড় ইংরেজ গোয়েন্দা ও বিলাতের সরকারের মধ্যে গোপন চিঠি ও তারবার্তা চালাচালি হচ্ছিল—ভারতীয় কমিউনিস্টদের কিভাবে দমন করা যায়। ভারত সচিবকে এক গোপন তারবার্তায় বড়লাট আরউইন লিখলেন "ভারতের পরিস্থিতি যথেষ্ট বাঁদিকে মোড় নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে বড় রকমের গোলমালের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।" (গোপন তার নং ২৫৫৫, ১৯ জানুয়ারি, ১৯২৯, ফাইল নং ১৮৪।২৯, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি, লণ্ডন)

এর ঠিক একমাস পরে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব হেগ সমস্ত প্রাদেশিক সরকারকে এক জরুরী বার্তা পাঠালেন: "ভারতীয় বিপ্লবীরা ও কমিউনিস্টরা হাত মেলাতে চলেছে। খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এইসব চরমপন্থীদের শক্তি বেশী বাড়তে দেওয়া মোটেই উচিত নয়।" (হেগের চিঠি ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯, ফাইল নং ৭১২।২৯, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি)

বোম্বাইয়ের গভর্নর ও ভারতে ইংরেজ গোয়েন্দা প্রধান ইসমঙ্গার দুজনেই সুপারিশ করলেন যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করা হোক। এই মামলার উদ্দেশ্য হবে "পার্টির সংগঠনকে ভেঙে চুরমার করা, নেতাদের গ্রেপ্তার করা, কমিউনিস্টদের কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতিকে জনসমক্ষে পেশ করা, যাতে দেশের বহু লোকই সরকারের কাজকে সমর্থন

করে।" ( ইসমঙ্গারের মেমোরাণ্ডাম, ১৭ জানুয়ারি, ১৯২৯, হ্যালিফ্যাক্স সংগ্রহ, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১১, ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি )

## কেন মীরাটকে বাছা হল

ভারত সরকারের বড় কর্তারা এর উপর মন্তব্য করলেন যে ভারতীয় জুরিদের সামনে যদি এই ষড়যন্ত্র মামলার বিচার হয়, তবে কমিউনিস্টরা সম্ভবত খালাস পেয়ে যাবে, কারণ ভারতের রাজনীতিবিদরা কমিউনিস্টদের প্রতি বেশ খানিকটা সহানুভূতিশীল, এবং জুরির সদস্যরা জনমতের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়।" (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯, হ্যালিফ্যাক্স সংগ্রহ, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃঃ ৫২ )

এরকম মন্তব্য করার কারণও ছিল। ইংরেজ কমিউনিস্ট ফিলিপ স্প্র্যাট যিনি তখন ভারতে শ্রমিক আন্দোলন করছিলেন, তিনি ১৯২৭-এ "ভারত ও চীন" বলে একটা বই লেখেন। বোম্বাই সরকার তাঁর বিরুদ্ধে, এই বই-এ রাজদ্রোহ প্রচারের জন্য এক মামলা করে। কিন্তু ১৯২৭-এর নভেম্বর মাসে, বোম্বাই হাইকোর্টে জুরিরা স্প্র্যাটকে মুক্তির নির্দেশ দেয়। ( বোম্বাই সরকার হোম/এফ এন/পি-৭৪, পৃঃ ১৮, ১৯২৮ )।

এইসব ভেবে চিন্তে, অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে বড়লাট আরউইন স্থির করলেন যে সারা ভারতে কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করে, উত্তর প্রদেশের কোনও একটি শহরে তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হোক, কারণ উত্তর প্রদেশে এদের বিচারের জন্য জুরি রাখার প্রয়োজন হবে না। সেইজন্যই আরউইন বেছে নিলেন উত্তর প্রদেশে, দিল্লীর কাছে ছোট্ট শহর মীরাটকে ( ভারত সচিবকে বড়লাট আরউনের গোপন তার ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯ )

## মীরাট বন্দীদের তালিকা

১৯২৯-এর ২০ মার্চ জাল গুটানো হল। বোম্বাই, কলকাতা, লাহোর, কানপুর প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্টদের বন্ধু ৩১ জন শ্রমিক আন্দোলনের নেতাকে অতর্কিতে গ্রেপ্তার করে মীরাটে নিয়ে আসা হল এবং সেখানেই শুরু হল ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। ৩১ জন বন্দীর নামগুলি এখন অনেকেরই পুরো জানা নেই। এই ছিল তাদের তালিকা : বোম্বাই

থেকে ১২ জন—এস ভি ঘাটে, এস এস মীরাজকর, কে এন যোগলেকর, আর এস নিম্ব্‌কর, এস এ ডাঙ্গে, এন এইচ ঝাবওয়ালা, এ এ আলওয়ে, গঙ্গাধর অধিকারী, এম জি দেশাই, ভি থেংডি, এল কদম, জি আর কাস্‌লে ; বাংলাদেশ থেকে ৮ জন—মুজফ্‌ফর আহমদ, সামসুল হুদা, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, রাধারমন মিত্র, কিশোরীলাল ঘোষ ও শিবনাথ ব্যানার্জী ; উত্তর প্রদেশ থেকে পি সি যোশী, অযোধ্যা প্রসাদ, গৌরী শঙ্কর ও বিশ্বনাথ মুখার্জী এবং পাঞ্জাব থেকে সোহন সিং যোশ, আবদুল মজিদ ও শউকৎ উসমানি। তাছাড়া ছিলেন তিনজন ইংরেজ—বেন ব্র্যাড্‌লি, ফিলিপ স্প্র্যাট ও লেস্টার হাচিনসন।

একটা সময় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা ঠিক করেছিলেন যে জওহরলাল নেহরুকেও তারা এই ষড়যন্ত্র মামলার মধ্যে জড়িয়ে, তাঁকেও আসামীর কাঠ-গড়ায় দাঁড় করাবেন। ১৯২৯-এর ৪ জানুয়ারি তারিখে স্বরাষ্ট্র সচিব হেগ এই মর্মে একটি গোপন দলিলও পেশ করেন ( এস গোপাল : জওহরলাল নেহরু, প্রথম খণ্ড, ১৯৭৬, পৃঃ ১২৪ )। কিন্তু পরে হেগ নিজেই সিদ্ধান্তে এলেন যে জওহরলাল ও কমিউনিস্টদের একসঙ্গে গ্রেপ্তার করে মামলা করলে, বামপন্থী জাতীয়তাবাদী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে এখন একটা সেতু নির্মাণ করে দেওয়া হবে যা খুই বিপজ্জনক। (ঐ)

## শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া

যাইহোক, কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করলে, বিশেষত শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে প্রতিক্রিয়া কি হবে, তাই ভেবে ভারত সরকার খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। বোম্বাই সরকার ভেবেছিল যে শ্রমিকরা ভীষণ বিক্ষোভ দেখাবে ( ভারত সচিবকে বড়লাট আরউইনের গোপন তার, ২০ মার্চ ১৯২৯, হ্যালিফ্যাক্স সংগ্রহ, পঞ্চদশ খণ্ড, পৃঃ ৬০ )। ২০ মার্চ ভোর থেকে বোম্বাই শহরের মোড়ে মোড়ে ইংরেজ সৈন্যদের পিকেট মোতায়েন করাও হয়েছিল, যাতে শ্রমিক গণবিক্ষোভ ফেটে না পড়ে (ঐ)।

আশঙ্কাটা একেবারে মিথ্যা ছিল না। ২১ মার্চ বোম্বাইতে এক রক্তাক্ত সাধারণ ধর্মঘটের জন্য জঙ্গী শ্রমিকরা প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু জেল থেকে বন্দী কমিউনিস্ট নেতারা তাদের কোনরকম হঠকারি কাজ করতে বারণ

করলেন। ফলে ধর্মঘট ফেটে পড়ল না। ( এম জি দেশাই : সাম অ্যানেক-ডোটস অব দি মীরাট কন্সপিরেসি কেস, "নিউএজ", ৫ অক্টোবর, ১৯৬৯ )

[ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির উদ্ধৃতিগুলির জন্য লেখক চিন্মোহন সেহানবীশের কাছে ঋণী]

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে, মীরাটে অভিযুক্ত শ্রমিক ও কমিউ-নিস্ট নেতাদের বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ চার্জশীট পেশ করা হয়, তার মূল অংশ পুনরুদ্ধৃত করা বোধ হয় প্রাসঙ্গিক হবে, কারণ অর্ধশতাব্দী পরে অনেকেরই জানা সম্ভব নয় যে ঠিক কি কি "অপরাধে" সাম্রাজ্যবাদ কমিউনিস্ট আন্দো-লনের আদিপর্বের নেতৃবৃন্দকে "আসামী"র কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল।

## সরকারি চার্জশীট

সরকারের অভিযোগপত্রটি ছিল এইরকম :

"১) রুশদেশে একটি সংগঠন আছে, তার নাম কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক। এই সংগঠনের লক্ষ্য হচ্ছে, পৃথিবীর সব দেশে প্রতিষ্ঠিত সরকারদের সশস্ত্র গণবিপ্লবের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা এবং তার জায়গায় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা, যে প্রজাতন্ত্রগুলি মস্কোস্থিত কেন্দ্রীয় সোভিয়েত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

২) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক কাজ করে তার বহু শাখা প্রশাখার মাধ্যমে, যেমন কমিণ্টার্নের কার্যকরী সভা কলোনিয়াল ব্যুরো, রেড ইন্টারন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি, প্যানপ্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েট, ইয়ং কমিউনিস্ট লীগ প্রভৃতি।

৩) কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রতিষ্ঠিত সরকারকে প্রথমে অচল ও পরে উচ্ছেদ করা। তার জন্য তাদের কর্ম পদ্ধতি হচ্ছে সাধারণ ধর্মঘট ও সশস্ত্র গণউত্থান। তাদের লক্ষ্যসাধনের জন্য তারা একটি একটি বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীও রচনা করেছে। সেখানে বর্ণিত মূল কথাগুলি এই—

ক) ধনতন্ত্র ও শ্রমিকতন্ত্রের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করা ;

খ) শ্রমিক ও কৃষকদল, যুবলীগ, ট্রেড ইউনিয়ন প্রভৃতি গড়ে তোলা, যাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য হবে ঐ সবশ্রেণীর বা অংশের মানুষদের কল্যাণসাধন। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হবে প্রচার করা ; এইসব দল ও সংগঠন আসলে নিয়ন্ত্রিত

হবে কমিউনিস্টদের দ্বারাই, তাঁরা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য সমর্থনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে, তাদের মধ্যে গোপনে কাজ করবে কমিউনিস্টদের গোষ্ঠী ;

গ) জাতীয়তাবাদী সংগঠনসমূহ ও বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যেও কমিউনিস্টরা ঢুকবে, গোষ্ঠী বানাবে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের দখল করে পরিচালিত করবে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের লক্ষ্যসাধনের জন্য ;

ঘ) ধর্মঘট ও হরতাল করার্থে, উত্তেজনা ছড়াবে ;

ঙ) বক্তৃতা, ইস্তাহার বিলি, পত্রপত্রিকা প্রকাশ ও সভাসমিতির মারফৎ রুশ বিপ্লবের আদর্শ প্রচার ;

চ) ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী সমস্ত আন্দোলনকে সমর্থন করা এবং সেগুলিকে নিজের কাজে লাগানো ।

## প্রধান ষড়যন্ত্রকারীরা

৪) ১৯২১-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত করেছিল যে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে তারা একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করছে, যার প্রধান সদস্য ছিল শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে, সউকৎ উসমানি এবং মুজাফ্ফর আহমদ । তারা আরও কিছু ব্যক্তির সঙ্গে মিলে ব্রিটিশ ভারতে মহামান্য সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতা উচ্ছেদের জন্য এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ।

৫) এরপরে, এদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দেয় বেঞ্জামিন ফ্রান্সিস ব্র্যাড্‌লি ও ফিলিপ স্প্র্যাট, যাদের ভারতে পাঠিয়েছে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকই, তাদের শাখা প্রশাখা প্রতিষ্ঠার ও প্রসারের এবং তাদের লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে ।

৬) যে সমস্ত অপরাধীদের নাম করা হয়েছে তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দা । তারা আরও বহু জানা ও অজানা ব্যক্তির সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র করেছে ভারতে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করার জন্য । তার জন্য কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের বিঘোষিত কর্মপদ্ধতিই তাদেরও কর্মপদ্ধতি এবং যেভাবে কমিন্টার্ণ আন্দোলন চালাতে বলেছে, সেইভাবেই তারা কাজ করে গেছে । এর জন্য অর্থ সাহায্যসহ, সবরকমের সাহায্যই তারা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কাছ থেকে পেয়েছে ।

৭) মীরাটসহ, ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে, মাঝে মাঝেই অভিযুক্ত ব্যক্তিরা

মিলিত হয়েছে, ষড়যন্ত্র করেছে, ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস্ পার্টি নামে দল গড়েছে, তার সম্মেলনও করেছে।" (মীরাট কমিউনিস্ট কনস্পিরেসি কেস, সেসনস্ মামলা নং ২, ১৯৩০ নথিপত্র প্রথম খণ্ড, ১৯৩২, পৃঃ ৩-৪, ভারতীয় মহাফেজখানা)

## আসামীর, কাঠগড়ায় সাম্রাজ্যবাদীরাই

এই মামলার পিছনে ব্রিটিশ সরকার ছাড়াও, ভারতের ইংরেজ ধনকুবের-দের স্বার্থেরও উৎসাহী সমর্থন ছিল। তাদেরই পরামর্শে ভারত সরকার প্রধান কৌঁসুলি হিসেবে নিযুক্ত করল প্রসিদ্ধ ইংরেজ আইনজীবী ল্যাংফোর্ড জেমস্‌কে। তাঁর সহকারি হলেন বাঙালি ব্যবহারজীবী জে পি মিত্র। আর অভিযুক্ত শ্রমিক ও কমিউনিস্ট নেতাদের সমর্থনে এসে দাঁড়াল জাতীয় আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মীরাট বন্দীদের সহায়ক সমিতির সভাপতি হলেন স্বয়ং পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও সম্পাদক হলেন তাঁর পুত্র জওহরলাল। সে যুগের বড়, মাঝারি, ছোট, প্রায় সমস্ত জাতীয়তাবাদী আইনজীবীই এসে দাঁড়ালেন অভিযুক্ত কমিউনিস্টদের সপক্ষে, তাদের হয়ে মামলা লড়লেন। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা এইভাবে প্রথমেই একটা বড় ধাক্কা খেল।

তবে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার একটি সবচেয়ে স্মরণীয় দিক হচ্ছে আলাদা বিবৃতি দিয়ে ও একসঙ্গে দলিল পেশ করে, বন্দী কমিউনিস্টরা আত্মপক্ষ সমর্থনের নামে সাম্রাজ্যবাদকেই দাঁড় করালেন আসামীর কাঠগড়ায়। তথ্য, যুক্তি ও আবেগ দিয়ে সোচ্চার প্রচার করলেন ভারতের কমিউনিস্টদের বিপ্লবের চরম ও আশু লক্ষ্য, কর্মসূচীও কর্ম পদ্ধতির কথা, রুশ বিপ্লবের কথা, মার্কসবাদের কথা। সাম্রাজ্যবাদী মামলার দৌলতে এইভাবে কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচারের যে সুযোগ তাঁরা পেলেন ও তার যে পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার তাঁরা করলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট আন্দোলন—উভয়ের ইতিহাসেরই তা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে নির্মূল করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের ষড়যন্ত্রটা এই স্তরে আর একটু তলিয়ে দেখা দরকার। ১৯২৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের কাছে এক জরুরী গোপন নির্দেশ পাঠিয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব লিখলেন: "জাতীয় বিপ্লববাদীরা

এবং কমিউনিস্টরা এক সঙ্গে কাজ করতে চাইছে। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী জওহরলাল নেহরু কমিউনিস্ট আদর্শের কয়েকটি দিকের দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি এই দুই শক্তির সেতু রচনা করছেন।" (হোম / পল / এফ এন ১৬৮, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৯) সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের কি কৌশল গ্রহণ করা উচিত? স্বরাষ্ট্র সচিব লিখছেন: "যে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা এখন কমিউনিস্টদের সঙ্গে সখ্যতা করতে চাইছে, কমিউনিস্ট আদর্শ জয়যুক্ত হলে তাদের শ্রেণী স্বার্থই সবার আগে বিপন্ন হবে। তাই আমাদের এমন কোনও কাজ করা উচিত নয়, যা এই দুই শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। আমরা নাক না গলালে এই দুটি আন্দোলন ভিন্ন পথেই যাবে। সুতরাং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কোনও দমনমূলক ব্যবস্থা নিলে, সাবধানে পা ফেলতে হবে, তা না হলেই জাতীয়তাবাদী মহলে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে ব্যাপক সহানুভূতি দেখা দেবে"। (ঐ)

## কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা

তাই ১৯২৯-এর ২০ মার্চ মীরাট জেলে ভারতের কমিউনিস্ট নেতাদের বন্দী করার পর, ষড়যন্ত্র মামলার সূচনাতেই সরকার পক্ষের প্রধান উকিল ল্যাংফোর্ড জেমস্ চেষ্টা করলেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও কমিউনস্টদের মধ্যে একটা বিভেদ ও বিচ্ছেদ ঘটাতে। তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতাটি সরকারি অর্থে ছাপিয়ে, হাজার হাজার কপি বিলি করা হল। তাতে তিনি বল্লেন:

"এই মামলার আসামীরা যে বিপ্লবের ষড়যন্ত্র করেছে তা জাতীয় বিপ্লব নয়। তা জাতীয়তা-বিরোধী বিপ্লব···তারা মনে করে যে মতিলাল নেহরু একজন বিপজ্জনক দেশপ্রেমিক। তাঁর ছেলে জওহরলালকে তারা মনে করে জোলো সংস্কারবাদী। সুভাষচন্দ্র বসুকে তারা বলে বুর্জোয়া এবং সুবিধাবাদী। গান্ধীকে তারা ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়াশীল মনে করে। কারণ এই আসামীদের মতে ঐ সব ব্যক্তিদের মতাদর্শ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ঐসব ব্যক্তিরা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন আর আসামীরা নির্ভেজাল বলশেভিক। ···আমি আসামীদের অভিযুক্ত করে বলছি—আপনারা আপনাদের দেশকে ভালবাসেন না; আপনারা দেশ-বিরোধী, ঈশ্বর-বিরোধী, পরিবার-বিরোধী। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এ কথা বলব যে একজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন

মানুষ যা কিছু ভাল মনে করে, একজন প্রকৃত বলশেভিক সে সব কিছুরই বিরুদ্ধে।" (লেবার মান্থলি, জানুয়ারি, ১৯৩০, পৃঃ ২৪-২৯)

ল্যাংফোর্ড জেমস্ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দুর্ভাগ্য এই যে তাঁদের এই বিষোদ্গার মোটের উপর জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ কোনও দাগ কাটতে পারল না এবং এর ফলে জাতীয়তাবাদী মহলে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ জাগ্রত হওয়ার বদলে, প্রায় সমগ্র জাতীয়তাবাদী শিবিরই মীরাট বন্দীদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন।

## জওহরলালের জবাব

১৯২৯-এর ২২ জুন, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে জওহরলাল নেহরু, ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ওয়াল্টার সিস্ট্রিনকে মীরাট বন্দীদের মুক্তি দাবী করে সক্রিয় হবার অনুরোধ জানিয়ে একটি তার পাঠান ও একটি চিঠি লেখেন। তাতে নেহরু লেখেন: "আমি একথা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে মীরাট মামলাকে ভারতের সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলবে না। সরকার সমগ্র শ্রমিক আন্দোলনের উপর যে আক্রমণ শুরু করেছে, এটা তারই অংশ। একথা ঘোষণা করেছে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্যকরী সভা। একথা মানতে বাধ্য হয়েছে এমনকি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও।

সরকার চীৎকার জুড়ে দিয়েছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। ভারতে অবশ্যই কিছু কমিউনিস্ট আছেন। কিন্তু তাঁদের ঘাড়ে যাবতীয় দোষ চাপিয়ে সরকার তার বহুবিধ পাপ ধামা চাপা দেবার চেষ্টা করছে।... মীরাটের ৩১ জন বন্দীর মধ্যে ৮ জন হচ্ছেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য।...সরকারের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে ধ্বংস করা..." (সি এইচ ফিলিপস সম্পাদিত: দি ইভল্যুশন অব ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড পাকিস্তান, লণ্ডন, ১৯৬৫, পৃঃ ২৬০)

## মীরাট বন্দীরা ও গান্ধীজি

স্বয়ং গান্ধীজিও জেলে দেখা করতে এলেন মীরাট বন্দীদের সঙ্গে, ১৯৩০-এর জানুয়ারি মাসে। সেই সাক্ষাৎকারের সরস বর্ণনা দিয়েছেন অন্যতম বন্দী এস এস মীরাজকর: "গান্ধীজি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে আসছেন

শুনে আমরা বেশ উত্তেজিত। আমরা তাঁকে আমাদের সঙ্গে খেতে অনুরোধ করলাম। তিনি রাজী হলেন। তবে তিনি নিরামিষ খান, ফলে সেদিন আমরা সবাই নিরামিষ খেলাম। দেখা হতেই গান্ধীজি প্রথমে পরিহাস করে বল্লেন: তোমাদের সঙ্গে আমার বেজায় ঝগড়া, কারণ তোমরা আমাদের সবচেয়ে দক্ষ সেক্রেটারিকে ভাগিয়ে তোমাদের দলে টেনে নিয়েছ। এ কথাটা তিনি বল্লেন রাধারমণ মিত্র সম্বন্ধে, যিনি ১৯২৩-২৪-এ দীর্ঘদিন সেবাগ্রামে ছিলেন গান্ধীজির সহকারি হিসাবে। রাধারমণ সহ আমরা সবাই পরিহাস উপভোগ করলাম।

তারপর গান্ধীজি বল্লেন: দেখ, তোমরা ১৯২১ থেকে প্রত্যেকটি কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এনেছ, আর আমি তার বিরোধিতা করেছি। কিন্তু এখন লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯) আমরা সবাই গ্রহণ করেছি পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যকে। সুতরাং তোমাদের সঙ্গে তো আমার আর বিরোধ নেই। এখন আমি জানতে চাই যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে আমরা আইন অমান্য সংগ্রাম শুরু করলে, তোমরা আমাদের সক্রিয় সমর্থন করবে তো?

আমরা উত্তর দিলাম যে আমরা তো পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে যে-কোনও সংগ্রামকে অবশ্যই সমর্থন করব। কিন্তু ১৯২২-এ চৌড়ি চৌড়ার ঘটনার পর আপনি যেভাবে আচমকা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, এবার আর সেরকম কিছু করবেন না তো? গান্ধীজি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বল্লেন: না, এবার শেষপর্যন্ত টানা সংগ্রাম চলবে।" (মীরাজকর: সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ১৯৭০)

মহাত্মা গান্ধী বা জওহরলাল নেহরু ছাড়াও বহু প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি, কংগ্রেস কর্মী ও জাতীয় বিপ্লববাদী সাধ্যমত সাহায্য করেছিলেন মীরাট বন্দীদের—সভা করে, প্রস্তাব নিয়ে, মামলার খরচের জন্য চাঁদা তুলে। বাংলাদেশেও তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদীরা মীরাট বন্দীদের সমর্থনে প্রথম থেকেই সক্রিয় হয়েছিলেন। বঙ্গীয় আইন সভায় কংগ্রেস দলের মুখ্য সচেতক সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে মীরাটে গিয়ে বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন ও দীর্ঘ তিনঘন্টা তাদের সঙ্গে কথা বলেন। তারপর কলকাতায় ফিরে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি বলেন: "মীরাট ষড়যন্ত্র

মামলার বন্দীদের সঙ্গে সরকার যৎপরোনাস্তি দুর্ব্যবহার করছে। অন্যতম বন্দী গোপাল বসাককে ঢাকা জেলে ৫ দিন নির্জন কারাকক্ষে রাখা হয়। তারপর হাতে হাতকড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁকে ঢাকা থেকে মীরাটে আনা হয়। দুই ইংরেজ বন্দী ফিলিপ স্প্র্যাট ও বেন ব্র্যাড্‌লিকে কার্যত নির্জন কারাকক্ষেই বন্দী রাখা হয়েছে, কারণ তাঁদের যেখানে আলাদা করে বন্দী রাখা হয়েছে, সেখানে কেউই ইংরেজি জানে না। স্প্র্যাট আমাকে জানালেন যে এর ফলে তাঁর খুবই মানসিক যন্ত্রণা হচ্ছে।

## বন্দীদের দুর্ভোগ

সমস্ত বন্দীরাই জানালেন যে খাবার খুবই খারাপ এবং তা খেয়ে তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বল্লে তিনি কিছুই করছেন না, আর মীরাটের দায়রা জজ বলছেন যে জেলের খাবার বন্দোবস্ত তাঁর দায়িত্ব নয়। ধূমপানের কোনও সুযোগ তাঁদের দেওয়া হচ্ছে না এবং বাড়ীর আত্মীয় স্বজনকে চিঠি লেখার স্বাধীনতা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত।

মীরাট বন্দীদের সপক্ষে কোনও ভাল উকিল এখনও নিযুক্ত হননি, অথচ ইংরেজ সরকার তাঁদের দীর্ঘ কারাদণ্ড দেবার জন্য একেবারে কোমর বেঁধে লেগে পড়েছেন। এ ব্যাপারে মীরাট মামলার বন্দীদের কেন্দ্রীয় সহায়ক সমিতির দায়িত্বই সবচেয়ে বেশী। বন্দীরা আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন যে তাঁদের সপক্ষে যেন একটি ঐক্যবদ্ধ কমিটি গড়ে তোলা হয় এবং নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে জওহরলাল নেহরুই যেন তাঁদের পক্ষ সমর্থনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।" (অমৃতবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ১৬ এপ্রিল, ১৯২৯)

## বন্দীদের সপক্ষে মীরাটের যুবসমাজ

ঐ একই দিনের অমৃতবাজার পত্রিকাতে 'সেবা সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, পরমাত্মা সরণ বৈশ্‌ ও সম্পাদক, বদ্রিপ্রসাদ বিশাল এক তাৎপর্যপূর্ণ চিঠি লেখেন। তাতে তাঁরা জানান যে "দিল্লী থেকে প্রকাশিত ২১ মার্চ তারিখের 'হিন্দুস্থান টাইমস্‌' পড়ে তাঁরা প্রথম জানতে পারেন যে সারা ভারতের ৩১ জন শ্রমিক ও কমিউনিস্ট নেতাকে বন্দী করে মীরাটে নিয়ে আসা হচ্ছে। মীরাটের কংগ্রেস কমিটি এ ব্যাপারে কোনও

কিছু করার উৎসাহ দেখান না। তখন মীরাটের বেশ কিছু প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক যুবক একত্র হয়ে 'সেবা সংঘ' নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে মীরাট বন্দীদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ২১ থেকে ২৮ মার্চ সেবা সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা ২৪ ঘন্টা মীরাট স্টেশনে পালা করে হাজির থাকে এবং যেমন যেমন বন্দীরা এসে পৌঁছয়, তেমন তেমন তাঁদের জল, খাবার, কাপড়, খবরের কাগজ, তেল, সাবান প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করে। তাঁরা জেলে পৌঁছবার পর সেবা সংঘর তরফ থেকে বন্দীদের নিয়মিত ফল, জামা-কাপড়, বই, পত্র-পত্রিকা, তেল, সাবান প্রভৃতি পাঠানো হচ্ছে—জেলের কানুন মেনে যতটা পাঠানো যায়। এইসব করতে আমাদের প্রায় ২০০ টাকা খরচ হয়েছে। তার অর্ধেক মীরাটেই চাঁদা তুলে সংগ্রহ করা, আর অর্ধেক পেয়েছি পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতা ডঃ সত্যপালের সৌজন্যে।

আমরা শুনেছি যে দিল্লীতে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর বাসায় এক বৈঠকে কংগ্রেস নেতারা মীরাট বন্দীদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার বাস্তব রূপ কিছু দেখা যায়নি। বন্দীদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভাল খাবার প্রত্যহ জেলে পাঠাতে হলে মাসে প্রায় ৮০০ টাকা খরচ হবে। তাছাড়া আছে মামলা চালাবার খরচ। তাই আমরা সমগ্র দেশবাসীকে এ ব্যাপারে অকৃপণ সাহায্য করার আহ্বান জানাচ্ছি।" (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৬ এপ্রিল, ১৯২৯)

## জাতীয়তাবাদীদের কর্তব্য

মীরাট বন্দীদের বেশ খানিকটা অবহেলা করা হচ্ছে, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও অন্যান্যদের এই অভিযোগে সাড়া দিয়ে পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকা "মীরাট বন্দীদের সপক্ষে" বলে একটা তীব্র সম্পাদকীয় লেখে তাতে বলা হয় "মীরাট বন্দীদের দুর্ভাগ্য এই যে তাঁদের মধ্যে নাম করা জাতীয় নেতা, রাঘব বোয়াল ধরনের কেউ নেই। যাঁরা বন্দী হয়েছেন জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা সবাই চুনোপুঁটি। ফলে তাঁদের সপক্ষে জাতীয় নেতারা এখনও সক্রিয় নন। এটা এক ধরনের উন্নাসিকতা।

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্ররাও মীরাট বন্দীদের সপক্ষে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে, এমন কথা বলা যাচ্ছে না। সামান্য আইনভঙ্গের অপরাধে অল্প কিছুদিন আগে কলকাতাতে যখন মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হল, তখন

সেকি হৈ চৈ! অথচ মীরাট বন্দীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ খুবই গুরুতর, ভারতে ইংলণ্ডেশ্বরের সাম্রাজ্য উচ্ছেদের চক্রান্ত। এর জন্য তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর পর্যন্ত হতে পারে! ন্যায় বিচারের নিয়মই এই যে, যত গুরুতর অপরাধের অভিযোগ, তত তাঁদের সপক্ষে আপ্রাণ চেষ্টা করা। কিন্তু মীরাট বন্দীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রায় কোনও সুযোগই নেই। সত্যেন্দ্র মিত্র বলেছেন যে এমনকি বন্দীরা গোপনে তাঁদের উকিলদের সঙ্গেও কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন না। জুরি প্রথায় তো বিচারই হচ্ছে না।

…ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি চান যে দেশে ও পৃথিবীতে তাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকুক, তাঁরা যদি শ্রমিকশ্রেণী ও যুবশক্তির আস্থা অর্জন করতে চান, তাহলে এইসব কমিউনিস্ট, ট্রেড ইউনিয়ন ও যুবলীগ নেতাদের সপক্ষে কেন্দ্রীয় সহায়ক কমিটিকে এখনই চাঙ্গা করে তুলুন, মীরাট বন্দীদের সর্বতোভাবে সাহায্য করুন।" (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭ এপ্রিল, ১৯২৯)

## ব্রিটিশ কমিউনিস্টদের ভূমিকা

কয়েকদিন পরে খবরের কাগজে একটি অন্য ধরনের কৌতূহলোদ্দীপক খবর বেরল। ইংলণ্ডের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে সার জন সাইমন স্পেন ভ্যালি কেন্দ্র থেকে দাঁড়াবেন বলে রক্ষণশীল দল ঘোষণা করেছে। ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছে যে পার্টি ঐ আসনে সাইমনের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে লড়বে এবং সেই প্রার্থী তারা করতে চায় মীরাট মামলার অন্যতম আসামী শউকৎ উসমানিকে। এবিষয়ে তারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেস নেতাদের মতামত জানতে চেয়েছে। এইভাবে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টি মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সাম্রাজ্যবাদী স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত করতে এগিয়ে চলেছে। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৮ এপ্রিল, ১৯২৯)

মীরাট জেলে বন্দীদের সঙ্গে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা। দীর্ঘদিন জেলে বন্দী থেকে বিচার চলায় মীরাট বন্দীরা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, এই সব খবর বাইরে আসতে থাকে। তখন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে এসব উড়ো খবর, মীরাট বন্দীরা সবরকম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে ও বহাল তবিয়তেই আছে। এই পরিস্থিতিতে বোম্বাইয়ের ফ্রীপ্রেস জার্নালের সংবাদদাতা সরেজমীনে তদন্ত করে এসে জানালেন যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের মোটেই নিয়মিত, পুষ্টিকর ও সন্তোষজনক

খাবার দেওয়া হচ্ছে না। তাদের খাবার জন্য যে আটা ও ডাল সরবরাহ করা হচ্ছে মান তার খুবই নিকৃষ্ট স্তরের। বাইরে থেকে সেবা সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা বন্দীদের জন্য নিয়মিত যে মাছ, মাংস ও তরিতরকারি পাঠিয়েছিলেন, তা বন্দীদের কাছে পৌঁছেছিল মাত্র একদিন। বাকী সব কদিনই তা তাঁরা পান নি, সম্ভবত সেগুলি জেল কর্তৃপক্ষের উদর পূর্তি করেছে। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ৩০ এপ্রিল, ১৯২৯)।

অন্য একটা সূত্র থেকে কলকাতায় খবর এল (এবং পরে দেখা গেল যে খবরটা সঠিক যে ৩২ জন বন্দীর মধ্যে ২১ জন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ৯ জনের গুরুতর পেটের গোলমাল হয়েছে, জ্বর হয়েছে অনেকের, মুজফ্‌ফর আহমদের পুরানো যক্ষ্মা রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। (পত্রিকা, ৩০ এপ্রিল, ১৯২৯)

## নরিম্যান ও চাগলার বন্দীপক্ষ সমর্থন

১৯২৯-এর ১২ জুন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের হয়ে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী কে.এফ নরিম্যান (পরে বামপন্থী আন্দোলন ও সুভাষচন্দ্র বসুর বন্ধু হিসাবে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের হাতে নানাভাবে নিগৃহীত) বিশেষ আদালতের বিচারক মিলনার হোয়াইটের কাছে দাবি জানালেন যে আসামীদের বিচার করার কোনও এক্তিয়ার মীরাটের আদালতের নেই। তিনি বল্লেন যে ৩১ জন বন্দীর মধ্যে ১২ জন বোম্বাইয়ের ও ১০ জন কলকাতার বাসিন্দা। সুতরাং এদের বিচার করতে পারে একমাত্র হাইকোর্ট এবং এদের মামলা চালাতে হবে জুরী প্রথাকে মেনে। এই ষড়যন্ত্র মামলা উপলক্ষে বোম্বাই, কলকাতা, লাহোর ও অন্য বহু শহরে পুলিস ব্যাপক খানাতল্লাসী করেছে। মীরাটে খানাতল্লাসী হয়েছে মাত্র ২টি জায়গায়। সুতরাং এই মকদ্দমাকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা বলে ঘোষণা করে, মীরাটে, জুরী প্রথা এড়িয়ে, বিশেষ আদালতে এই বিচার চালনা চরম অসাধুতা ও প্রতারণা। আসলে ইংরেজ সরকার কমিউনিস্ট বন্দীদের মৌলিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৪ জুন, ১৯২৯)।

বন্দীদের পক্ষে অপর একজন আইজনজীবী এম সি চাগলা (স্বাধীনতার পরে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন) আদালত কক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করলেন যে জুরী প্রথায় বিচার পাবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার প্রতিটি

ভারতীয় নাগরিকেরই আছে। সুতরাং মীরাট মামলাটিই আইন বিরোধী। (পত্রিকা, ১৩ জুন, ১৯২৯)

ইউরোপীয় বিচারক নরিম্যান ও চাগলার আপত্তি অগ্রাহ্য করলেন, কিন্তু তাদের যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারলেন না। বরঞ্চ জাতীয়তাবাদী আইনজীবীদের তীক্ষ্ণ সমালোচনায় বিব্রত ও বিচলিত হয়ে তিনি আদালত দশ দিনের জন্য স্থগিত রাখলেন।

## ল্যাংফোর্ড জেমসের কমিউনিস্ট বিদ্বেষ

আদালত আবার বসল ২৪ জুন। তখন সরকার তরফের প্রধান উকিল ল্যাংফোর্ড জেমস কমিউনিজমের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ শুরু করলেন। তিনি বললেন যে রাশিয়ায় অবস্থিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সমস্ত সভ্যদেশের সরকারগুলিকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে উচ্ছেদ করে সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা করা ভারতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের এই ধরনের বিপজ্জনক প্রচারের প্রধান নায়ক হচ্ছে মানবেন্দ্রনাথ রায়। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৫ জুন, ১৯২৯)

পরদিন ল্যাংফোর্ড জেমস দেখাবার চেষ্টা করলেন যে মীরাট বন্দীরা প্রকাশ্যে ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস পার্টি গড়লেন বোম্বাইতে, কলকাতায় ও উত্তর প্রদেশে। তাছাড়া বোম্বাইয়ের গিড়নি কামগড় ইউনিয়ন, কলকাতায় চটকল মজদুর ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন রেলপথে ইউনিয়ন গড়ে, কমিউনিস্টরা সারা ভারতের শ্রমিক আন্দোলনকে দখল করার চেষ্টা করেছিলেন। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬ জুন, ১৯২৯) জেমস আরও বল্লেন যে এই বন্দীরা বরাবর মে দিবস পালন করে এসেছে এবং স্যাকোভ্যানজেটির মামলা নিয়েও এদেশে জোর প্রচার করেছে। সর্বোপরি বন্দীদের উদ্দেশ্য ছিল "মহামান্য" ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ করে ভারত থেকে ইংরেজ রাজত্বকে বিতাড়িত করা। (পত্রিকা, ২৬ জুন, ১৯২৯)

মামলা যখন বিচারাধীন তখন বড়লাট আরউইন এক বক্তৃতায় কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিষোদ্গার করেছেন, এই পরিস্থিতিতে ন্যায় বিচার অসম্ভব হয়ে উঠছে—এই বলে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর কাছে মীরাট মামলা সমিতি এক তারও পাঠিয়ে দিলেন। (পত্রিকা, ২৬ জুন, ১৯২৯)। সেই প্রেক্ষাপটে বিচারক হোয়াইট ৯ জুলাই পর্যন্ত মামলা স্থগিত রাখলেন।

মীরাট মামলা চলতে লাগল। ইতিমধ্যে ১৯২৯-এর ডিসেম্বর মাসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত হল পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। ১৯৩০-এর শুরু থেকেই আরম্ভ হল দেশব্যাপী গণ-আইনঅমান্য আন্দোলন। হাজার হাজার মজুর, চাষী, ছাত্র-যুবক, মেয়ে-পুরুষ ভর্তি করতে লাগল জেলখানা। তাদের উপর জেলখানায় বর্বর অত্যাচার করতে লাগল ইংরেজ সরকার। মীরাট জেলও তার ব্যতিক্রম ছিল না। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কমিউনিস্ট বন্দীরা ততদিনে এক বছরেরও বেশি বিচারধীন বন্দী রয়েছেন, লড়ছেন নিজেদের অধিকারের জন্য। কিন্তু দেশের বৃহত্তর মুক্তি আন্দোলনের কথাও তাঁরা ভোলেন নি। তাঁদের পাশের কয়েদখানাতেই সত্যাগ্রহী বন্দীদের উপর পুলিসের বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা রুখে দাঁড়ালেন, সবাই মিলে সই করে এক প্রতিবাদপত্র পাঠালেন উত্তর প্রদেশের ইংরেজ গভর্নরের কাছে। সেই খোলা চিঠি, সামান্য সংক্ষেপ করে তুলে দিচ্ছি, অর্ধশতাব্দী পরের পাঠকদের অবগতির জন্য।

## সত্যাগ্রহীদের পাশে মীরাট বন্দীরা

"মাননীয় গভর্নর, আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারীরা আপনার কাছে জানাচ্ছি যে—

(১) ১৯২৯-এর মার্চ মাস থেকে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত হিসাবে, বিচারাধীন বন্দীরূপে, মীরাট জেলা কারাগারে বন্দী আছি;

(২) গণ-আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে এই জেলের বন্দীদের সংখ্যা এমন বিপুলভাবে বেড়েছে যে, জেলে সর্বাধিক যত লোক ধরে, তার চেয়ে অনেক বেশি বন্দী জেলে ঢোকানো হচ্ছে;

(৩) রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সর্বপ্রকার বৈষম্যমূলক আচরণেরই আমরা বিরোধী। তদুপরি, যেভাবে এই সত্যাগ্রহী বন্দীদের 'এ', 'বি' এবং 'সি' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, তা সরকারের নিজের তৈরি নিয়ম-কানুনেরও বিরোধী;

(৪) 'সি' শ্রেণীর বন্দীদের যে ধরনের খারাপ খাবার দেওয়া হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে তারা প্রথম থেকেই প্রতিবাদ জানিয়েছে;

(৫) এই ধরনের নিকৃষ্ট খাবার খেতে তারা অস্বীকার করলে, তাদের হাতকড়া ও ডাণ্ডাবেড়ি পরিয়ে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে;

(৬) সত্যাগ্রহী বন্দীদের উপর সাধারণ কয়েদীদের দিয়ে হামলা করানো হয়েছে ;

আর তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহীরা প্রতিবাদ করলে, তাদের বলা হচ্ছে : ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাহলেই তোমরা মুক্তি পাবে ;

(৭) অনেক ছেলেমানুষ সত্যাগ্রহীদের দুর্বৃত্ত কয়েদীদের সঙ্গে বন্দী করে রাখায় যে সব ঘটনা ঘটেছে, তা যত কম বলা যায়, ততই ভাল ;

(৮) বহু সত্যাগ্রহী বন্দীদের তাদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না ;

## জেলের মধ্যে নির্মম অত্যাচার

(৯) ২৯ আগস্ট সকালবেলা আমরা 'সি' শ্রেণীর বন্দীদের কারাকক্ষ থেকে আর্তনাদ শুনে দৌড়ে বেরিয়ে দেখি, যে লাঠি ও বন্দুক নিয়ে বহু পুলিস, জেলরক্ষক, জেলের সুপার ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে 'সি' শ্রেণীর বন্দীদের কারাকক্ষে ঢুকে তাদের পেটাচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলে এই নারকীয় অত্যাচার ;

(১০) ঐ দিনই দুপুর ১২টার পর, আদালত থেকে ফিরে, আমরা দেখি যে সত্যাগ্রহীদের তখনও বেত মারা হচ্ছে ও কয়েক জনের রক্তাক্ত দেহ মাটিতে পড়ে ;

(১১) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বলছেন, তিনি নাকি তদন্ত করে দেখেছেন যে সত্যাগ্রহীরা 'বিদ্রোহ' করেছিল, তাই তাদের ঐরকম শাস্তি দেওয়া হয়েছে। তদন্ত করলেন তিনি মিনিট কয়েক মাত্র, আর শাস্তি দেওয়া হল কয়েক ঘণ্টা ধরে ;

(১২) সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে 'বিদ্রোহ' দমন করতে গিয়ে কোনও বন্দীকে আঘাত করা হয়নি। আমরা দৃঢ়ভাবে বলছি যে এটা অসত্য ভাষণ ;

(১৩) ৫৬ জন সত্যাগ্রহীকে ডাণ্ডাবেড়ি পরানো হয়েছিল, ১৩ জনকে ৩০ ঘা করে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল।

এটা অমানুষিক অত্যাচার ;

(১৪) যাদের বেত মারা হয়েছিল, তাদের বয়স মাত্র ১৭ থেকে ২২-এর মধ্যে ;

(১৫) কয়েকজন ফিরিঙ্গি পুলিস ইন্সপেক্টর বেত মারার নিয়ম কানুন ভেঙ্গে এমনভাবে সত্যাগ্রহীদের বেত মারে, যে তারা গুরুতর আহত হয়, কিন্তু তারপর তাদের কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি। এদের মধ্যে একজন বন্দী এখনও মাঝে মাঝেই যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়ছে;

## দৃপ্ত প্রতিবাদ

(১৬) ১৮ মাস আমরা এই জেলে বিচারাধীন বন্দী। আমাদের সমস্ত মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আমরা আপনার সামনে তুলে ধরছি, ২৯ আগস্টের বর্বর অত্যাচারের প্রতিকার ও তদন্ত দাবি করছি, 'সি' শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার দাবী করছি।"

ইতি—

স্বাঃ এস এস মিরাজকর, ডি আর থেংডি, সোহন সিং যোশ, এস এ ডাঙ্গে, শিবনাথ ব্যানার্জি, অযোধ্যা প্রসাদ, জি অধিকারী, আর এস নিম্ব্‌কর, কে এন যোগলেকর, এম এ মজিদ, এল আর কদম, ধরণী গোস্বামী, সামসুল হুদা, গোপেন্দ্র চক্রবর্তী, রাধারমণ মিত্র, এম জি দেশাই, গোপাল বসাক, কিশোরীলাল ঘোষ, এ এল আলওয়ে, গৌরীশঙ্কর, এস এইচ ঝাবওয়ালা, জি আর কাসলে, মুজফ্‌ফর আহমদ, ভি এন মুখার্জি, পি সি যোশী, কে এন সায়গল, এইচ এল হাচিনসন, ফিলিপ স্প্র্যাট, বি এন ব্র্যাড্‌লি, শউকৎ উসমানি ( মীরাট, ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ )

শুধু কমিউনিস্ট-বিরোধীরাই নন, কিছু কিছু বামপন্থী পণ্ডিত ব্যক্তিরাও আজকাল প্রবন্ধ লিখছেন যে গোড়ার যুগের কমিউনিস্টরা নাকি জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারাটির সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখতেন না। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার সম্পূর্ণ ইতিহাসই এই অসত্য ভাষণের বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ। উপরে উদ্ধৃত খোলা চিঠিটি সেই প্রতিবাদেরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাই ভারতের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রথম ষড়যন্ত্র মামলা নয়। তার আগে পেশোয়ারে (১৯২২) ও কানপুরে (১৯২৪) তাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ষড়যন্ত্র মামলা করেছে। কিন্তু পেশোয়ার বা কানপুর ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তেমন কোনও দাগ কাটতে পারে নি। তার

অন্যতম প্রধান কারণ ছিল এই যে বন্দী কমিউনিস্টরা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার-কক্ষকে বৈপ্লবিক রাজনৈতিক প্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন নি। কিন্তু মীরাটে তা পেরেছিলেন।

মীরাট বন্দীদের সপক্ষে বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ জাতীয়তাবাদী উকিল লড়েছিলেন, একথা ঠিক। কিন্তু মীরাটের ১৮ জন কমিউনিস্ট বন্দী স্থির করেন যে তাঁরা একত্রে একটি সম্মিলিত বক্তব্য রাখবেন, যার মূল কথা হবে ভারতের কমিউনিস্টরা কি চায়, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তাদের কর্মসূচী, রণনীতি ও রণকৌশলই বা কি। বহু বইপত্র পড়ে, বহু দলিলপত্র ঘেঁটে, কঠোর পরিশ্রম করে তাঁরা বিশাল এক দলিল রচনা করেন ও ১৮ জন কমিউনিস্ট বন্দীর তরফে আর এস নিম্ব্‌কর, তা বিচারক ইয়ার্কের আদালতে বেশ কয়েক দিন ধরে পাঠ করেন। তৎকালীন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে এই দলিলের ব্যাপক প্রচার হয়, আদালতের সূত্র ধরে। ফলে ছোট্ট কমিউনিস্ট পার্টির যা সীমিত ক্ষমতা ছিল, তার চেয়ে ঢের বেশি প্রচার হয় কমিউনিস্ট আদর্শ, কর্মসূচী ও রণনীতির। সাম্রাজ্যবাদ মীরাট বন্দীদের কণ্ঠরোধ করে দেশ থেকে সাম্যবাদকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল। ফল হল তার বিপরীত।

## ১৮ জন কমিউনিস্টের যুক্ত বিবৃতি

কোন ১৮ জন বন্দী সই করেছিলেন এই যুক্ত বিবৃতিতে? তাঁরা হলেন আর এস নিম্ব্‌কর, কে এন যোগলেকর, জি অধিকারী, এস এস মীরাজকর, এস ভি ঘাটে, মুজফ্‌ফর আহমদ, সামসুল হুদা, গোপাল বসাক, রাধারমণ মিত্র, ধরণী গোস্বামী, গোপেন্দ্র চক্রবর্তী, সোহন সিং যোশ, পি সি যোশী, শউকৎ উসমানি, অযোধ্যা প্রসাদ, এম এ মজিদ, বেন্ ব্র্যাড্‌লি ও ফিলিপ স্প্র্যাট। এই বিবৃতিতে সই দেন নি এস এ ডাঙ্গে, তিনি স্বতন্ত্র বিবৃতি দিয়েছিলেন। যুক্ত বিবৃতির দলিলটি ১৯৬৭-তে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে মুজফ্‌ফর আহমদের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে। ৩০০ পৃষ্ঠার ইংরেজি বই নাম দেওয়া হয়েছে সঠিকভাবেই : কমিউনিস্টস্ চ্যালেঞ্জ ইম্পিরিয়ালিজম ফ্রম দি ডক। ডাঙ্গের স্বতন্ত্র বিবৃতিও বোম্বাই থেকে ইংরেজিতে ছেপে বেরিয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেক কমিউনিস্ট বন্দী একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত

জবানবন্দীও দেন। এসব কিছুই পাওয়া যায় ভারতীয় মহাফেজখানাতে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বহু হাজার পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ নথিপত্রে।

৩০০ পৃষ্ঠার দলিলের বঙ্গানুবাদ করে এই ধারাবাহিক রচনাতে দেওয়া সম্ভব নয়। স্বতন্ত্র বই ছাপা দরকার। তবে সেই দলিলে বিষয়বস্তু কি কি ছিল তার একটা ধারণা ও কিছু কিছু উদ্ধৃতি তুলে দেব, যাতে বন্দী অবস্থাতেও কি অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের আদিপুরুষরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিল, তার কিছুটা আন্দাজ এই প্রজন্মের সহযোদ্ধারা পেতে পারেন।

## দলিলের সূচীপত্র

দলিলটির সূচীপত্রটি এই রকম :

১। মুখবন্ধ,
২। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা বিপ্লব অবধারিত।
৩। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারা।
৪। ধনতন্ত্র সম্বন্ধে মার্কসের বিশ্লেষণ।
৫। ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে বিপ্লবী উত্তরণ অনিবার্য।
৬। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ।
৭। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী।
৮। রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।
৯। ধনতন্ত্রের অবলুপ্তি, এন ই পি।
১০। বিপ্লবের কীর্তিসমূহ।
১১। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।
১২। সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র।
১৩। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।
১৪। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতি।
১৫। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ।
১৬। ভারতে বিপ্লব ও ভারতীয় ধনিকশ্রেণী।
১৭। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লবী মোর্চা।
১৮। ভারতে বিপ্লব ও ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণী।
১৯। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সঙ্ঘ।

২০। ঔপনিবেশিক বিপ্লব ও সমাজবাদী আন্তর্জাতিক।
২১। ঔপনিবেশিক বিপ্লব ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক।
২২। ভারতীয় কৃষকদের দারিদ্র্য।
২৩। কৃষি সমস্যা সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী।
২৪। কৃষি সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুতে শ্রেণী সংগ্রাম।
২৫। সমস্যাটির রূপরেখা।
২৬। কৃষিতে ধনবাদের অনুপ্রবেশ।
২৭। উনিশ শতক—তীব্র কৃষি সঙ্কট।
২৮। উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহগুলি।
২৯। কৃষিতে অবক্ষয় রোধ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা।
৩০। সাম্রাজ্যবাদী কৃষি নীতির মৌলিক অন্তর্দ্বন্দ্ব।
৩১। কৃষি সমস্যার সমাধান কৃষকরাই করবে।
৩২। বর্তমানে ভারতীয় কৃষকদের শ্রেণীবিন্যাস।
৩৩। কৃষি সমস্যা সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী।
৩৪। ১৯৩০-৩১-এর কৃষক সংগ্রামগুলির অভিজ্ঞতা।
৩৫। কৃষি বিপ্লবই সমস্যার একমাত্র সমাধান।
৩৬। ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস পার্টির কৃষক-কর্মসূচী।
৩৭। কৃষি ব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর।
৩৮। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন—বিপ্লবী বনাম সংস্কারবাদী।
৩৯। সংগঠন।
৪০। শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা।
৪১। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন।
৪২। আশু দাবী।
৪৩। "জাতীয় বুর্জোয়াদের কাজে লাগাও"।
৪৪। যুক্তফ্রন্ট।
৪৫। গান্ধীবাদ।
৪৬। ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ।
৪৭। সংবিধানিক রাজনীতি।
৪৮। বুর্জোয়াদের "বিপ্লবী" রণকৌশল।
৪৯। বৈপ্লবিক গণসংগ্রাম।

৫০। হিংসার প্রশ্ন।

৫১। পরিবার, মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা।

৫২। ব্যক্তি স্বাধীনতা।

৫৩। ধর্ম।

৫৪। বুর্জোয়া নীতিজ্ঞান।

৫৫। রাজা ও আইন।

৫৬। মীরাট মামলার "সুবিচার"।

৫৭। উপসংহার।

সূচীপত্র থেকেই বোঝা যায় কি বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে, কি সুগভীর বিশ্লেষণ এই দলিলে করার চেষ্টা হয়েছিল। আজ থেকে ৫০ বছর আগেও কতটা রণনৈপুণ্য কমিউনিস্টরা আসামীর কাঠগড়াতে দাঁড়িয়ে দেখিয়েছিলেন ও কার্যত দেশবাসী ও পৃথিবীর সামনে সাম্রাজ্যবাদকেই আসামী প্রমাণ করেছিলেন—দলিলটির কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে তা দেখবার চেষ্টা করব।

বন্দী কমিউনিস্টরা তাঁদের দীর্ঘ বক্তব্যের সূচনা করেছিলেন অত্যন্ত ধারালোভাবে। তাঁরা লিখেছিলেন: "এই মামলার গভীর রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। পুলিস স্রেফ ৩১ জন অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে, ব্যাপারটা এত সহজ নয়। এটা শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসে একটা দিকচিহ্ন। একটা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক মৎলব নিয়ে তারা এই মামলা শুরু করেছে। ভারতের বিটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার তাদের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে আঘাত হানবার জন্য এই মামলা শুরু করেছে, যে শত্রু তাদের শাসন ও শোষণকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ না করে থামবে না, অর্থাৎ এই দেশের গরীব নিপীড়িত জনগণ। এ আঘাত শুধু ৩১টি ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, ভবিষ্যতে বিপ্লবী গণসংগ্রামের পথে যারাই চলতে চায়, এ আঘাত তাদের সবার উদ্দেশ্যে একটা সতর্কবাণী। তারা চাইছে এইভাবে "আইনসঙ্গত" ও "সাংবিধানিক" উপায়েই শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনকে চূর্ণ করতে। সরকার পক্ষ যতই অস্বীকার করুক, এই মামলার বহিরাবরণ উঁচানো আছে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামের বিরুদ্ধেই। তাই এই মামলার আইন কানুনের দিক নিয়ে আমরা মাথা

ঘামাচ্ছি না। আমরা মামলার এই গভীর নিহিত অর্থ নিয়েই আমাদের বক্তব্য পেশ করব।

## কমিউনিস্টরা ক্ষমা ভিক্ষা চায় না

এই বিচারালয়ের সামনে আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করব না, এমনকি ন্যায়-বিচারও প্রত্যাশা করব না। এটা একটা শ্রেণীস্বার্থের বিচারালয় শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধেই আমাদের অপরাধ, সুতরাং তাদের হাত থেকে ন্যায়বিচার পাবার প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাম্রাজবাদী নিষ্ঠুরতার যূপকাষ্ঠে নিজেদের অসহায় বলির পাঁঠার মত ঠেলে দিতেও আমরা রাজী নই। আমরা সাম্রাজ্যবাদের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়াচ্ছি, বলছি যে আমাদের উপর প্রতি-শোধাত্মক ব্যবহার করলে, তাদের পাঞ্জা লড়তে হবে সমগ্র সাম্রাজ্যের শোষিত শ্রেণী ও নিপীড়িত জনগণের সঙ্গে।"(কমিউনিস্টস্ চ্যালেঞ্জ ইম্পিরিয়ালিজম ফ্রম দি ডক, পৃঃ ১)

এই সময় ভারতবর্ষে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা চলছিল—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর বীর সাথীদের বিরুদ্ধে চলছিল এই মামলা। জেলে ও হাজতে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অপমানকর ও অত্যা-চারী ব্যবহারের প্রতিবাদে, তাঁরা দীর্ঘদিন অনশন ধর্মঘট করেন। আত্মাহুতি দেন বাংলার বীর সন্তান যতীন দাস। ভগৎ সিং ও তাঁর সাথীরাও আদালত কক্ষে নিজেদের বক্তব্য পেশ করে সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের নগ্ন স্বরূপকে দেশবাসীর সামনে উদঘাটিত করছিলেন। মীরাট বন্দীদের ও তাঁদের এই লড়াই সমগ্র ভারতের তরুণ মুক্তি সংগ্রামীদের মনে নতুন উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল।

মীরাট বন্দীদের পদ্ধতি ছিল আক্রমণাত্মক। লাল জুজুর অভিযোগকে তাঁরা তাই এড়াবার চেষ্টা না করে প্রথমেই সাফ বলেছেন : "বক্তব্যের সূচনাতেই আমরা আদালতকে এবং আদালতের মারফৎ ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্য-বাদের দুনিয়াকে, ভারতের সামন্ত-জমিদার গোষ্ঠীকে বিশেষভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে আমরা কমিউনিস্ট। আমরা মার্কস ও এঙ্গেলসের কথার প্রতিধ্বনি করে বলছি : কমিউনিস্টরা তাদের লক্ষ্য ও কর্ম পদ্ধতির কথা লুকিয়ে রাখতে ঘৃণা বোধ করে। তারা খোলাখুলিই ঘোষণা করে যে প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থাকে সবলে উৎখাত করে তবেই তাদের উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে।" (ঐ পৃঃ ১-২)

## কমিউনিস্টদের আশু লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সর্বহারা বিপ্লবের মধ্যে সম্পর্ক কি হবে, সে বিষয়েও স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছিলেন মীরাট বন্দীরা, তাঁরা বলেছিলেন: "ভারতের মত উপনিবেশে, সর্বহারা বিপ্লবের আগে সংগঠিত করতে হবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে।

সেই বিপ্লব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করবে। সমস্ত সামন্ত ও মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটাবে, এবং প্রতিষ্ঠা করবে এক স্বাধীন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। এই বিপ্লবের জন্যই আমরা এখন সর্বশক্তি নিয়োগ করছি। তার জন্য আমরা দেশের সামনে উপস্থিত করছি সেই বিপ্লব করার উপযোগী সমস্ত শ্রেণীদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যবদ্ধ মোর্চার কর্মসূচী। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সাফল্য অর্জনের সেটাই একমাত্র পথ।" (ঐ, পৃঃ ২)

এর পর মীরাট বন্দীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নে দেশ দুর্গতির কোন চরম সীমায় এসেছে, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। কৃষির দৈন্য, কুটিরশিল্প ধ্বংস, কলকারখানা খুলতে না দেওয়া এবং তার ফলে শুধু মজুর-চাষীই নয়, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীও যে ইংরেজ রাজত্বের উপর বিক্ষুব্ধ এবং তাই ভারতের বিপ্লব যে অবধারিত—তার তীক্ষ্ণ বর্ণনা তারা চিত্রিত করেছেন। সরকার পক্ষকে বিদ্রূপ করে তাঁরা লিখেছেন: "সরকার ভারতবর্ষকে শান্ত, সন্তুষ্ট ও নিস্তরঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। আর মস্কো নাকি সেই ভারতবর্ষকে গুঁতিয়ে বিপ্লবের পথে ঠেলে দিতে চাইছে। ভারতে বিপ্লবকে সংগঠিত করার কাজে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক বা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্য নিতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই। কিন্তু ভারতে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে উঠবে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকলাপের ফলে নয়; ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও নিপীড়ন এবং ভারতের জনগণের দারিদ্র্য ও দুর্গতির অনিবার্য পরিণতি হিসাবেই।" (ঐ পৃঃ ৭)

তৎকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি সম্বন্ধেও প্রখর কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন মীরাট বন্দীরা। রাষ্ট্রসংঘের মুখোসের আড়ালে ইংরেজ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা কিভাবে তাদের আগ্রাসী ঔপনিবেশিক নীতি চালিয়ে যাচ্ছে তার বিশদ বিশ্লেষণ করে দলিলটিতে লেখা হচ্ছে: "ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ হাসিল করার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার

হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘ। এর মারফৎ তারা মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ওপর অর্থনৈতিক সামরিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাইছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হামলা করতে চাইছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা যুদ্ধ চায়, তাই তাদেরই অঙ্গুলি হেলনে পরিচালিত রাষ্ট্রসংঘের ক্ষমতা নেই যুদ্ধকে রোখার। বরঞ্চ বিশ্ববাসীকে প্রতারিত করে, তারা যুদ্ধ প্রস্তুতিকে সঙ্গোপনে চলতে সাহায্য করবে…।” (কমিউনিস্টস্ চ্যালেঞ্জ ইম্পিরিয়ালিজম ফ্রম দি ডক, পৃঃ ২৪)

## ঔপনিবেশিক মুক্তিসংগ্রাম

ঔপনিবেশিক মুক্তিসংগ্রাম সম্বন্ধে দলিলে লেখা হয়েছে: “সাম্রাজ্যবাদ মানে শুধু ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগই নয়, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সচেতন বিপ্লবেরও যুগ। যুদ্ধের পরের বছরগুলিতে ঔপনিবেশিক বিপ্লবের প্রচণ্ড অগ্রগতি দেখা গেছে। তার সূচনা হয় ১৯১৬-তে আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনে ইস্টার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে—সেই বিপ্লব চলেছিল কার্যত ১৯২২ পর্যন্ত। ১৯১৯-এ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোরিয়াতে গণবিদ্রোহ হয়েছিল। একই বছরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধ বেধে ওঠে। ভারতবর্ষ ও মিশরে স্বাধীনতার দাবীতে তুমুল গণবিক্ষোভ হয়। তারপর ১৯২৪ ২৫ ফরাসীদের উপনিবেশ সিরিয়া ও লেবাননে গণঅভ্যুত্থান ঘটে যায়। ১৯২৫-এ ছড়িয়ে পড়ে চীনের মহান গণবিপ্লব। যবদ্বীপে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান ঘটে ১৯২৬ এ। দক্ষিণ আমেরিকাতেও একাধিক গণবিপ্লব দেখা দেয়…এমনকি আফ্রিকার ইঙ্গ-ফরাসী উপনিবেশগুলিতে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ইরাকে, সাইপ্রাসে, মাল্টাতে, সুদূর স্যামোয়া দ্বীপেও সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী গণসংগ্রামের ঢেউ দেখা গেছে।” (ঐ, পৃ: ২৪ ২৫)

সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধেও মন্তব্য করতে ভোলেন নি বন্দীরা “১৯১৮-২১-এর হস্তক্ষেপের যুদ্ধে পৃথিবীর ধনিকশ্রেণী সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে পারল না। সোভিয়েতের বিপুল জনবল ও সম্পদ আজকে ধনবাদী ব্যবস্থার আওতার বাইরে চলে গেছে। সেদেশে যত শিল্পায়ন এগোচ্ছে, ততই সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা দৃঢ়তর হচ্ছে, বুর্জোয়া জগতের অবস্থা দুর্বল হচ্ছে এবং পৃথিবীজোড়া শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামগুলিকে জোরদার করছে।… তাই বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক শক্তি হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।” (ঐ, পৃ: ২৫)

## সোভিয়েত-বিরোধী বিকৃতির জবাব

মহান নভেম্বর বিপ্লবের চরিত্রকে বিকৃত করে আদালতকক্ষে সরকারি উকিল ল্যাংফোর্ড জেমস্ যেসব বিষোদ্গার করেছিলেন, তার তীক্ষ্ণ জবাব দিয়ে দলিলে লেখা হয়েছে, "সরকারী উকিল সেই বস্তাপচা ও উদ্ভট বক্তব্য রেখেছেন, যে মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী রুশ বিপ্লব হওয়াই উচিত হয়নি, আর যদিবা হয়েছে, তা একটা সাচ্চা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয়। এতে করে ছদ্মবেশে ধনতন্ত্রই আবার দেখা দেবে। এ অপপ্রচার নতুন নয়, এ তত্ত্ব প্রথম ঢাকঢোল পিটিয়ে জাহির করেছিলেন দলত্যাগী কাউটস্কি। তাঁর বক্তব্য ছিল যে সর্বহারা বিপ্লব প্রথম একটি অগ্রসর ধনবাদী দেশে হওয়া উচিত ছিল। লেনিন তাঁর ধারালো জবাব দিয়ে বলেছেন যে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থায়, যেখানে শৃঙ্খলটা সবচেয়ে নড়বড়ে হয়ে গেছে, সর্বহারা বিপ্লবকে সেখানেই সংগঠিত করতে হবে। সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশের মধ্যে সবার আগে রাশিয়াতেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে যাওয়ায় বিভ্রান্তির কোনও কারণ নেই।" (ঐ, পৃ: ২৭-২৮)

সাম্রাজ্যবাদী জারতন্ত্রী রাশিয়ার পরাধীন ও নিয়ন্ত্রিত উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ সম্পর্কে দলিলে স্বাভাবিকভাবেই বেশ খানিকটা লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে "১৯১৯-এ আফগানিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত রাষ্ট্র তার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ১৯২৫-এ সোভিয়েত-আফগান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় উভয় দেশের সমান অধিকার, মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার যৌথ প্রতিশ্রুতি দিয়ে।...পারস্যকে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে শোষণ ও লুণ্ঠন চালাচ্ছিল ইংলণ্ড ও জারতন্ত্রী রাশিয়া। ১৯২০তে একতরফাভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন পারস্যের সঙ্গে জারতন্ত্রী রাশিয়ার অন্যায় চুক্তিকে নাকচ করে দিল, রাশিয়ার কাছে পারস্যের সমস্ত দেনা মকুব করে দিল এবং পারস্যকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে মাথা তুলতে সাহায্য করল...।" (ঐ, পৃঃ ৪৮)

## জাতীয়তাবাদী মহলে প্রতিক্রিয়া

এই প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেব যে ১৯২০-২১ এ সোভিয়েত রাশিয়া তার প্রতিবেশী দুর্বল রাষ্ট্রগুলি সম্বন্ধে যখন একের পর এক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী

ও বন্ধুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করছিল, তখন আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী মহলে তার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। সোভিয়েত-পারস্য ও সোভিয়েত-আফগান চুক্তিকে সপ্রশংস অভিনন্দন জানিয়ে কলকাতার বিশিষ্ট ইংরেজি জাতীয়তাবাদী দৈনিক সম্পাদকীয় লিখল "বন্ধুত্বের সম্পর্ক"। (অমৃতবাজার পত্রিকা, ২ এপ্রিল ১৯২১)

একই সময়ে কলকাতার একটি বাংলা জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিকে লেখা হল: "ইরানের সঙ্গে রাঙাবলশীর যে সন্ধি হয়েছে, তাতে পারস্যের সঙ্গে আগেকার জার গভর্ণমেন্টের যেসব আপৎ-মতলবী দাবি-দাওয়া চুক্তিপত্র ছিল তা নাকচ হয়ে গেছে। ১৮১৩ সালে রুশকে যেসব দ্বীপ আর জায়গা-জমিন পারস্য গুঁতো খেয়ে ছেড়ে দিয়েছিল, মাসী সেসব বোনপোকে ফিরিয়ে দিয়েছে। পারস্যকে যেসব টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল, আর সেজন্য পারস্যের খাজনার উপর মান্ধাতার আমলে রুশের যেসব দাবি-দাওয়া ছিল, তাও মাসী ছেড়ে দিয়েছে। পারস্যের রেল, তার, টেলিফোন, পথ-ঘাট, বন্দরে রুশের অধিকার সে রাখবে না।" (বিজলি, ৮ এপ্রিল, ১৯২১)

একমাস পরে আবার লেখা হল: "রুশিয়ার সঙ্গে পারস্যের আফগানিস্তানের যে সন্ধি হয়েছে, তার ফলে ঐ দুটো দেশে ইংরেজের আর বেশি দন্তস্ফুট করতে হবে না।..." (বিজলি, ৬ মে ১৯২১)

আফগানিস্তান ও পারস্য বরাবরই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতা ও জাতীয় অগ্রগতি রক্ষার সংগ্রামে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসাবে পেয়ে এসেছে সোভিয়েত রাশিয়াকে—১৯১৯-২১-এ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ১৯৭৯-৮৪তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সে যুগের জাতীয়তাবাদীদের বা মীরাটে বন্দী প্রথম যুগের কমিউনিস্টদের, কারুরই কিন্তু সত্য নিরূপণে কোনও বিভ্রান্তি হয়নি।

বিপ্লবের স্তর সম্বন্ধেও মীরাট বন্দীদের চিন্তাধারা স্বচ্ছ ছিল। ভারতে কমিউনিস্টদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে সবলে উচ্ছেদ করে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা। মীরাটের দলিলের ভাষায়: "ভারতের বিপ্লব হবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব, তবে ঔপনিবেশিক দাসত্বের ফলে তার চেহারাটা কিছুটা ভিন্নতর হবে।" (কমিউনিস্টস্ চ্যালেঞ্জ ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম ফ্রম দি ডক, পৃঃ ১০৩)।

বিপ্লবের নেতৃত্ব ও মূল শক্তি সম্বন্ধে দলিলে লেখা হয়েছিল : "শ্রমিক-শ্রেণীই ভারতে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে। কৃষকরা গ্রামাঞ্চলে সামন্ততান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক শোষণ উচ্ছেদ করে কৃষি বিপ্লবকে বিজয়ী করবে। কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রাণকেন্দ্রকে আক্রমণ করবে শ্রমিকশ্রেণীই, শহরের গরীব, কারিগর ও মধ্যবিত্তদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে। তারাই নির্মাণ করবে নতুন রাষ্ট্র, গড়ে তুলবে নতুন সমাজ ব্যবস্থা। এই বিপ্লবকে তাই পরিচালিত করবে শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর দল। ( ঐ, পৃঃ ১০২ )

## বুর্জোয়াদের ভূমিকা সম্বন্ধে বিভ্রান্তি

কিন্তু দেশের ধনিক শ্রেণীর ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল্যায়নের প্রশ্নে মীরাট বন্দীদের বেশ খানিকটা গোলমাল ছিল। ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর কোনও বৈপ্লবিক ভূমিকা (তা যতই সীমাবদ্ধ হোক) আছে, তা তাঁরা অস্বীকার করেছেন। এমন কি মধ্যবিত্তের ভূমিকাকেও যথেষ্ট তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন। যার ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দক্ষিণ ও বামপন্থীদের বিরোধকে তাঁরা লোক দেখানো মনে করতেন। ১৯২৮-এর কলকাতা কংগ্রেসে সুভাষ-জওহরলালের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থানকেও তাঁরা বিশেষ কোনও গুরুত্ব দেন নি। (ঐ পৃঃ ৮৯—১০০)

রণনীতির এই বিভ্রান্তি থেকে রণকৌশলের ক্ষেত্রে তাঁদের ভ্রান্তি ছিল আরও গুরুতর। দেশব্যাপী গণআইন-অমান্য আন্দোলনের গুরুত্বকে তাঁরা খাটো করে দেখেছিলেন, তার নেতিবাচক দিকগুলির উপরই তাঁরা বেশি জোর দিয়েছিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা বলে তাঁরা সঠিক সমালোচনাই করেছিলেন। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আপসহীন গণসংগ্রামের আহ্বানে যে লক্ষ লক্ষ সাধারণ দেশপ্রেমিক তেরঙ্গা ঝাণ্ডা হাতে ১৯৩০-৩২-এ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং দক্ষিণপন্থী, আপসকামী বুর্জোয়া জাতীয় নেতৃত্ব সম্বন্ধে যাঁদের দ্রুত মোহভঙ্গ হচ্ছিল, তাদের বিকল্প বিপ্লবী পথে আকৃষ্ট করতে হলে, তাদের আস্থা অর্জন করতে হলে যে ঐ গণ-আইন-অমান্যে সক্রিয় ও সবচেয়ে নিঃস্বার্থ অংশগ্রহণ করা দরকার, তবেই যে তাঁরা পরে কমিউনিস্টদের সমালোচনায় কান দেবে, আপসহীন সহযোদ্ধা হিসাবে, তাদের দিকে সশ্রদ্ধভাবে তাকাবে আন্দোলনের বাইরে থেকে, শুধু নেতিবাচক

সমালোচনা করলে তাদের মধ্যে শুধু বিরূপ প্রতিক্রিয়াই হবে—এটা মীরাট বন্দীরা যেন বুঝেও বুঝলেন না।

## কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভূমিকা

এ ব্যাপারে অবশ্য কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসের সঙ্কীর্ণতা দোষ দুষ্ট ঔপনিবেশিক থিসিসের ও পরবর্তীকালের আরও ভ্রান্ত পরামর্শর দায়িত্ব অনেকখানি। তারা বার বার লিখছিলেন যে ভারতের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একমাত্র ভূমিকা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে বেইমানি করা এবং নেহরু-সুভাষের মত 'বামপন্থী' জাতীয়তাবাদীদের ভূমিকা হচ্ছে বামপন্থী বাগাড়ম্বরের আড়ালে একই ভূমিকা পালন করা, যাতে জনগণ প্রকৃত বৈপ্লবিক বিকল্পের দিকে চলে না যায়। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের মুখপত্র 'ইনপ্রেকর' থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিলে বক্তব্যটা স্পষ্ট হবে।

## সুভাষচন্দ্র ও কমিউনিস্টরা

"সুভাষচন্দ্র বোসদের সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব কি হওয়া উচিত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে 'ইনপ্রেকর' লিখছেন:

"১৯৩৩-এর ১০ জুন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় সম্মেলনে প্রেরিত সভাপতির অভিভাষণে সুভাষ বোস জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের পরাজয়ের কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে সমাজতন্ত্রী দল নাম দিয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল ভারতে গঠন করা হোক। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ঘটে গেল লক্ষ লক্ষ ভারতীয় শ্রমজীবীরা এখন তার অভিজ্ঞতা ও ফলাফলের হিসাব নিকাশ করছেন। তাঁরা ভাবছেন: এর পরে কি করব? ব্রিটিশ অত্যাচার ও শোষণের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার সঠিক পথ কি? কি করলে আবার মাঝরাস্তায় আমরা খানাখন্দে পড়ে যাব না? ভারতের লক্ষ লক্ষ শৃঙ্খলিত শ্রমজীবীদের সাহায্য করার জন্য আমাদের সুভাষ বোসের বক্তব্যের জবাব দিতে হবে। কারণ সুভাষ বোসের এই তথাকথিত নতুন নীতি স্বাধীনতার সংগ্রামকে সাহায্য করে না। বরঞ্চ এতে শ্রমজীবী জনগণের দাসত্ব আরও গভীর হয়ে মাটিতে গেড়ে বসবে।...আসলে গান্ধী ও সুভাষের মধ্যে তফাৎ এইটুকুই যে

সুভাষ মনে করেন যে আরও অনুকূল শর্তে আপস করা যেত। লণ্ডনে প্রেরিত সভাপতির ভাষণের তৃতীয় পৃষ্ঠায় সুভাষ লিখেছেন: 'নেতারা যদি আপস করাই ঠিক করলেন (অর্থাৎ গান্ধী-আরউইন চুক্তি) তাহলে তাঁদের আরও সুবিধাজনক মুহূর্ত বেছে নেওয়া উচিত ছিল। আর ৬ মাস আন্দোলন চালিয়ে গেলেই সে সুযোগ তাঁরা পেতেন।' অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের 'সংগ্রামী' চেহারা হচ্ছে আরও কিছুদিন আন্দোলন চালিয়ে, আরও সুবিধাজনক শর্তে আপস করা···তাছাড়া তিনি আইনসভা নির্বাচনে অংশ নেওয়া ও তাতে যোগ দেবারও পক্ষে। দেশবন্ধু দাসের ভূমিকাতে সুভাষচন্দ্র নামতে চান। তফাৎ এই যে তাঁর মুখে আরও বেশী প্রগতিশীল কথাবার্তা।

···অর্থাৎ সুভাষচন্দ্ররা যদি নতুন দল গড়েন, তার, আরও সংগ্রামী কথাবার্তা বলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে চাপ দিয়ে আরও ভাল আপস করবেন এবং সেই ভাবে ভারতের বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশকে কমিউনিস্টদের দিকে যেতে না দিয়ে, নিজেদের, অর্থাৎ গান্ধীর বিকল্প বুর্জোয়া নেতৃত্বে টেনে আনতে সচেষ্ট হবেন। ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার পথে বাধা সৃষ্টিই হবে তাঁর বাস্তব ভূমিকা।'' (ইনপ্রেকর, ১৩ খণ্ড, ৫২ নং সংখ্যা)

## ১৯৩৬-৩৭-এ ভ্রান্তি সংশোধন

এর সঙ্গে আমরা যদি তুলনা করি এর মাত্র ৫ বছর পরে, বেআইনী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রণকৌশলকে, তাহলেই ভ্রান্তিটা আমাদের সহজে বোধগম্য হবে। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭-এ লক্ষ্ণৌ ও ফৈজপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুকে এবং ১৯৩৮ ও ১৯৩৯-এ হরিপুরা ও ত্রিপুরার কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসুকে সমর্থন করে ভারতের কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট ও তার চালিকা শক্তি হিসাবে কমিউনিস্ট, সমাজ-তন্ত্রী ও বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের ঐক্য গড়ে তুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করে-ছিলেন। ততদিনে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে সংশোধিত হয়েছে সংকীর্ণতাবাদী ভ্রান্তি, গৃহীত হয়েছে ফ্যাসীবাদী ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী যুক্তফ্রন্টের রণকৌশল। ভারতে এসে পৌঁছেছে ব্র্যাড্‌লি-দত্ত থিসিস (ইনপ্রেকর, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৬)। তবে সেসব স্বতন্ত্র, বিস্তারিত আলোচনার বিষয়। এই প্রবন্ধের কাজ তা নয়।

এ প্রজন্মের বিশেষ কেউই সব কজন মীরাট বন্দীর পরিচয় জানেন না বিশেষ করে ১৯ জন কমিউনিস্ট বন্দীর। তবে সমস্যা এই যে, এই ১৯ জনের প্রায় প্রত্যেকেই শ্রমিক ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের দিকপাল। সংক্ষেপে তাঁদের প্রতি কতটা সুবিচার করতে পারব জানি না। কোনও প্রাদেশিকতা দোষ দুষ্ট হয়ে নয়, রচনার সুবিধার জন্য বাংলাদেশের কমিউনিস্ট বন্দীদের পরিচিতি দিয়েই আরম্ভ করছি। তাঁরা ছিলেন এই ক'জন : রাধারমণ মিত্র, গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, গোপাল বসাক, সামসুল হুদা ও মুজফ্‌ফর আহমদ।

## রাধারমণ মিত্র

রাধারমণ মিত্রকে দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করছি। ১৯৬৮-র ১১ সেপ্টেম্বর আমার সঙ্গে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে রাধারমণ মিত্র তাঁর নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন এবং আমার লেখা ইংরেজি বই "কমিউনিজম অ্যাণ্ড বেঙ্গলস্ ফ্রীডম মুভমেণ্ট" প্রথম খণ্ডের ২নং পরিশিষ্টে যা সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তারই সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ এখানে পরিবেশন করছি।

"আমি যখন হিন্দু স্কুলের ছাত্র, তখন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত ছোটদের "মুকুল" পত্রিকাতে গান্ধীজির ছবি দেখি। তার সঙ্গে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকাতে তিনি যে সংগ্রাম করেছেন, তার বর্ণনা। সেই কৈশোরেই গান্ধীজির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা জন্মে গেল। ১৯১৬-তে গান্ধীজি কলকাতায় এসে কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা করলেন—ফিজিতে ভারতীয় ক্ষতবন্দী শ্রমিকদের উপর যে নির্মম অত্যাচার চলে তার সম্বন্ধে। ১৯১৭-তেও গান্ধীজি আবার কলকাতায় এলেন, সঙ্গে লোকমান্য তিলক, মদনমোহন মালব্য ও সরোজিনি নাইডু। সকলের বক্তৃতাই আমি শুনলাম।

তারপর সাহস সঞ্চয় করে দেখা করলাম গান্ধীজির সঙ্গে। সারাদিন তাঁর সঙ্গে কথা হল লেখাপড়া ছেড়ে আমি তাঁর সঙ্গে চলে যেতে চাইলাম। গান্ধীজি বারণ করলেন। বললেন : লেখাপড়া শেষ কর, তৈরী থেক, সময় হলে ডাক পাঠাব।

## এটোয়াতে শিক্ষকতা

১৯১৮-১৯-এ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ডাক্তাররা হাওয়া বদল করার পরামর্শ দিলেন। উত্তরপ্রদেশের এটোয়া সহরে একটি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে আমি সেখানে চলে গেলাম। মনপ্রাণ দিয়ে পড়াতাম, ফলে ওখানকার ছাত্র ও অভিভাবকরা আমাকে খুবই ভালবাসত।

বছরখানেকের মধ্যে শুরু হয় গান্ধীজির নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগের গণআন্দোলন। ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত আগমণের প্রতিবাদে এটোয়ার স্কুলের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট করল ও যুবরাজের সম্মানে তৈরী ব্যাজ পরতে অস্বীকার করল। সরকার ভীত হল এবং প্রধান শিক্ষক আমাদের সবাইকে ডেকে বললেন ঃ তোমরা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী, একথা লিখে বণ্ড সই কর। আমি রাজী হলাম না, ইস্তফা দিলাম চাকরীতে। কলকাতা রওনা হবার জন্য তৈরী হলাম। ইতিমধ্যে ছাত্ররা ধর্মঘট করে, দল বেঁধে আমাকে এসে বলল ঃ মাস্টারমশাই যাবেন না। আমরা সবাই জাতীয় স্কুল গড়ে তুলব, আপনাকে তার ভার নিতে হবে।

'না' বলতে পারলাম না। রয়ে গেলাম। ছাত্ররা আমাকে কাঁধে করে নিয়ে গেল সহরের ময়দানে, সেখানে তখন অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে বিরাট জনসভা হচ্ছিল। সেই সভা থেকেই সিদ্ধান্ত হল ঃ এটোয়াতে জাতীয় স্কুল স্থাপন করা হবে। একজন গান্ধীবাদী ধনী একটা বড় বাড়ী দিলেন স্কুল চালাবার জন্য। আমি হলাম বিনা বেতনে প্রধান শিক্ষক। স্বদেশীপন্থী কলেজের ছাত্ররা এসে বিনা পয়সায় স্কুলে পড়াতে শুরু করল। সহরবাসীর কাছ থেকে চাঁদা করে স্কুল চলতে লাগল। জয়চাঁদের ভাঙা দুর্গে হল আমার আস্তানা। সঙ্গে থাকত স্কুলের উঁচু ক্লাসের ২০-২৫ জন ছাত্র। প্রকৃত অর্থে আমরা পরস্পরের 'কমরেড' হয়ে উঠলাম।

## অসহযোগের আবর্তে

এটোয়াতে তখন কংগ্রেসের কোনও সংগঠন ছিল না। গরমের ছুটির সময় আমি ও একদল ছাত্র গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে, অসহযোগের সপক্ষে প্রচার করতে লাগলাম। দেখতে দেখতে বহু গ্রামে গড়ে উঠল কংগ্রেস সংগঠন। জেলা

কংগ্রেস কমিটিও গঠিত হল। তার সভাপতি হলেন একজন মুসলিম আইনজীবি, আমি হলাম সম্পাদক। এটোয়াতে ১০ হাজার মানুষের সমাবেশ হল। সেখানেই আমি জীবনের প্রথম হিন্দিতে বক্তৃতা করলাম।

গান্ধীজি, মতিলাল নেহরু ও আলি ভ্রাতারা উত্তর প্রদেশ ঘুরলেন। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অভূতপূর্ব জোয়ার দেখা দিল। মতিলাল এটোয়াতে এলে খোলা গাড়িতে বসিয়ে, হাজার হাজার ছাত্র তাঁকে টেনে নিয়ে এল সভায়। এটোয়ার এই বিপুল গণউদ্দীপনা দেখে মতিলাল অভিভূত হলেন।

১৯২১-এ একদিন মাঝরাতে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করল। উত্তেজিত জনতা পুলিসকে ঘেরাও করল: আমাকে নিয়ে যেতে দেবে না। তখন আমি বক্তৃতা করলাম: আমি সত্যাগ্রহী, আমাকে জেলে যেতে দাও। নৈনি জেলে আমি বন্দী রইলাম। নৈনি জেলের সুপারই আমাকে কার্ল মার্কস রচিত ক্যাপিটাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি পড়ার সুযোগ করে দেন। ১৯২১-এর শেষে মুক্তি পেয়ে আমি সোজা এটোয়া ফিরে গেলাম। কংগ্রেস থেকে আমাকে এটোয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হতে অনুরোধ করা হল। আমি রাজী হলাম না। চৌরি চৌরার পর যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহৃত, তখন আমি আবার ফিরে এলাম বাংলাদেশে।

[ এইখানে বলে নেওয়া ভাল যে নিজের স্মৃতিচারণ, এটোয়াতে তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাই আরো সপ্রশংসভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে স্বাধীনতার পর উত্তর প্রদেশ সরকার, উত্তর প্রদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপারে দলিল-দস্তাবেজসহ যে বই লিখেছেন তাতে। সেখানে বলা আছে যে মিত্রজী অর্থাৎ রাধারমন মিত্র, এটোয়াতে এতই জনপ্রিয় হয়েছিলেন, যে এটোয়ার মানুষ তাঁকে 'এটোয়ার গান্ধী' বলত।—গো. চ. ]

## গান্ধীজির প্রতি মোহভঙ্গ

কলকাতায় ফিরে আমি চলে গেলাম গান্ধীজির সবরমতী আশ্রমে। গান্ধীজি তখন জেলে। ৭ মাস আমি আশ্রমে ছিলাম। কিন্তু রকম সকম সেখানকার ভাল না লাগায় কলকাতায় ফিরে এলাম। গান্ধীজি জেল থেকে বেরিয়েই আমাকে চিঠি লিখলেন, ডেকে পাঠালেন। গেলাম রাজকোটে, দেড় বছর কাটালাম গান্ধীজির সঙ্গে। গান্ধীজিকে আমি গভীরভাবেই ভালবেসেছিলাম ও শ্রদ্ধা করতাম। তিনিও আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তবু

আদর্শগত কারণে গান্ধীজির সঙ্গ চিরদিনের মত ছেড়ে, আমি ফিরে এলাম কলকাতায়। মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা: শ্রমিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করব। সময়টা ১৯২৫।

বঙ্কিম মুখার্জি আমার ছেলেবেলার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আর এক বন্ধু—অরুণ চন্দ্র সেনের মারফৎ বঙ্কিম আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বল্লেন: চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে আমাদের সঙ্গে হাত লাগাও। খাব কি? স্বরাজ্য-দল নিয়ন্ত্রিত কলকাতা কর্পোরেশনের প্রথম শিক্ষা সচিব হয়েছিলেন। আমার আর এক বাল্যবন্ধু, অধ্যাপক ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। কর্পোরেশনের একটি প্রাথমিক স্কুলে তিনি আমাকে প্রধান শিক্ষকের চাকুরী দিলেন। ১৯২৬ বা ১৯২৭-এ আমি গড়ে তুললাম কলকাতা কর্পোরেশন প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রথম ইউনিয়ন।

## শ্রমিক ধর্মঘটের সমর্থনে

১৯২৮-এর সূচনাতে কলকাতায় ধাঙড় ধর্মঘট হল। প্রভাবতী দাসগুপ্তা ছিলেন ধাঙড় ইউনিয়নের সভানেত্রী, আর ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস পার্টি ছিল এর প্রধান চালিকা শক্তি। ১৯২৮-এর ৮ মার্চ মনুমেন্টের নীচে ধাঙড় ধর্মঘটের সমর্থনে বিরাট শ্রমিক সমাবেশ হল। আমি সেখানে গেলাম প্রাথমিক শিক্ষকদের তরফে সৌহার্দ্য জানাতে। গোপেন চক্রবর্তী সাদরে আমাকে কাছে টেনে নিলেন ও তাঁরই সৌজন্যে সমাবেশে আমি বলবার সুযোগ পেলাম। সেইদিন থেকেই গোপেন ও আমি পরম বন্ধুতে পরিণত হলাম।

১৯২৮—এই আমি জড়িয়ে পড়লাম চেঙ্গাইল চটকল ধর্মঘটে। আমিই সেখানে নিয়ে গেলাম ফিলিপ স্প্র্যাটকে—মজুরদের মনোবলকে চাঙ্গা করার জন্য। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে ৫০ হাজার ধর্মঘটী শ্রমিকদের মিছিল নিয়ে গেলাম আমরা সবাই। ধর্মঘটী মজুরদের হাতে তেরঙ্গা ও লাল ঝাণ্ডা। তারপর ১৯২৯-এর ১৯ জানুয়ারি কলকাতায় সাইমন কমিশন এলে তার বিরুদ্ধেও বিরাট শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত করলাম আমরা।

## আমি কমিউনিস্ট

১৯২৯-এর ২০ মার্চ পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করল, ধরে নিয়ে গেল মীরাট। শুরু হল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা। আমি তখন কমিউনিস্টদের বন্ধু, কিন্তু কমিউনিজম সম্বন্ধে আমার ধারণা তখনও অস্পষ্ট। জেলখানায় খুব বই পড়ি। একদিন মুজফ্‌ফর আহমদের হাতে দেখলাম একটা বই—লাইফ অ্যাণ্ড টিচিংস অফ কার্ল মার্কস। চেয়ে নিলাম পড়তে। ঐ বই আমার চোখ খুলে দিল। আরও অনেক বই পড়লাম। তারপর একদিন মীরাটের আদালতে দৃপ্ত ঘোষণা করলাম—আমি বিশ্বাসের দিক থেকে নিশ্চিতভাবেই একজন কমিউনিস্ট। সেই বিশ্বাস আমার আজও অটুট আছে।"

রাধারমণ মিত্রর বয়স এখন ৮৭—দেহে, মনে সজীব, সতেজ। ১৯৮৩-র সেপ্টেম্বরে, কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে বিরাট যুদ্ধবিরোধী সম্মেলনের মঞ্চ থেকে দৃপ্ত কণ্ঠে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের ডাক দিয়ে, তিনি আবার প্রমাণ করলেন যে, কোনও দলে না থাকলেও তিনি একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট।

এবার আলোচনা করব পদ্মাপারের ছেলে গোপেন চক্রবর্তীর কথা। ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে ৪ দিন ধরে তাঁর সঙ্গে আমার যে সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার হয় ও আমার ইংরেজি বইয়ের পরিশিষ্ট 'ক'-তে যে সন্নিবিষ্ট আছে, তা থেকে সংক্ষেপ করে তাঁর পরিচিতি লিখছি।

## গোপেন চক্রবর্তী

তাঁর জন্ম ১৮৯৯-তে, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অঞ্চলে। ছেলেবেলাতেই বাবা-মা'র সঙ্গে চলে যান চাঁদপুরে। ইস্কুলের লেখাপড়া সেখানেই। ১২/১৩ বছর বয়সে কিশোর গোপেন যোগ দেন বিপ্লবী অনুশীলন দলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে, আটক রাখে বিনা বিচারে। বন্দীশালায় তাঁর উপর চলে অকথ্য অত্যাচার, কিন্তু ভাঙতে পারে না তাঁর মনোবল।

১৯১৭-র নভেম্বর মাসে যখন রুশ বিপ্লব হল তখন তিনি মেদিনীপুর জেলে আটক বন্দী। সেইখানেই অনশন ধর্মঘট করে তাঁরা প্রথম আদায় করলেন

'স্টেসসম্যান' ও পরে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পড়বার অধিকার। তিনি বলছেন :

"ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র 'স্টেটসম্যান' রোজই প্রাণ খুলে গালি-গালাজ করত সোভিয়েত রাশিয়াকে বিশেষত লেনিনকে। তার ফলে আমাদের এ ধারণা আরও দৃঢ় হল যে ঐ দেশে সত্যই প্রগতিশীল কিছু ঘটছে···অমৃতবাজার পত্রিকার পাতা থেকে বলশেভিক রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চরিত্র আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং আমাদের মুক্তিরও ঐ পথ, এই ধারণার দিকে আমরা ঝুঁকতে আরম্ভ করলাম।" ( সাক্ষাৎকার কলকাতা, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ )

## নলিনী গুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ

১৯২০-তে জেল থেকে ছাড়া পেলেন গোপেন্দ্র। বছরখানেকের মধ্যে ভারতে এলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ভারতীয় সদস্য মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দূত নলিনী গুপ্ত। বিপ্লবী অনুশীলন দল নলিনীকে ঢাকায় আশ্রয় দিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল তরুণ গোপেন চক্রবর্তীর।

নলিনীর কাছেই তিনি প্রথম শুনলেন রুশ বিপ্লব, সোভিয়েত বিপ্লব ও লেনিনের বহু চিত্তাকর্ষক কাহিনী। তার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই গোপেন্দ্র রূপান্তরিত হলেন একজন কমিউনিস্ট সমর্থকে। ঠিক হল গোপেন্দ্র যাবেন সোভিয়েত রাশিয়াতে।

তাঁর নিজের জবানীতেই আবার বলি : "১৯২৩-এ হল্যাণ্ডগামী একটি জাহাজে মুসলমান খালাসী সেজে যাত্রা করলাম। হেজাজ হয়ে, মার্সাই বন্দর হয়ে, অবশেষে পৌঁছলাম রটার ডামে। একমাস পরে গেলাম হামবুর্গে। সেখানে তখন একটা বিপ্লবী প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, ফলে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে চলছে শ্বেত সন্ত্রাসের যুগ। প্রায় আশা ছেড়েই দিয়েছি, তখন একদিন রাতে দেখা হয়ে গেল নলিনীর চেনা বাঙালি বিপ্লবী যতীন মিত্রর সঙ্গে। তার সঙ্গে গেলাম বার্লিন। দেখা হল এম এন রায়ের সঙ্গে। আমার মনে তখন বহু প্রশ্ন, বহু সন্দেহ। রায়কে জিজ্ঞাসা করলাম : বিপ্লবের নেতৃত্ব তো দেয় বুদ্ধিজীবীরা। মজুর চাষীরা কেমন করে তার নেতৃত্ব দেবে? রায় আমাকে ধৈর্যের সঙ্গে বহুক্ষণ বোঝালেন, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। তখন রায় বললেন : শুনুন, এভাবে আপনি বুঝবেন না। তার চেয়ে

রাশিয়াতে চলে যান, গিয়ে নিজের চোখে দেখুন মজুররা কেমনভাবে রাষ্ট্র চালাচ্ছে। তখন আপনা থেকেই সব বুঝতে পারবেন।" (সাক্ষাৎকার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)

## কলকাতা থেকে সোভিয়েত দেশে

বার্লিন থেকে গোপনে গোপেন্দ্র গেলেন লেনিনগ্রাদ ও সেখান থেকে মস্কো। তারপর ১৯২৫-এ ফিরে এলেন ভারতে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কমিউনিস্ট হয়ে। পুরানো বন্ধু ধরণী গোস্বামীর সঙ্গে মিলে গড়ে তুললেন বাংলাদেশে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি, যার পিছনে ছিলেন মুজফফর আহমদ, আবদুল হালিম প্রভৃতি। তারপর কোমর বেঁধে লাগলেন চটকল মজুরদের সংগঠিত করার কাজে।

ধরণী গোস্বামীর আহ্বানে ১৯২৬-এ তিনি ঢাকাতে গেলেন এবং দুই বন্ধুতে মিলে অনুশীলন দলের বহু তরুণকেই আকৃষ্ট করলেন সাম্যবাদের দিকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ময়মনসিংহের বিপ্লবী মণি সিং (পরে হাজংদের লড়াইয়ের অবিস্মরণীয় নেতা ও বর্তমানে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি) ও ঢাকার তরুণ বিপ্লবী গোপাল বসাক। এই গোপাল বসাকই পরে গড়ে তোলেন নারায়ণগঞ্জে সূতাকল মজদুর ইউনিয়ন।

## চটকল শ্রমিকদের মধ্যে

১৯২৭-এ কলকাতায় ফিরে গোপেন উঠেপড়ে লাগলেন শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে। ভাটপাড়া চটকলে মাসে ১৪ টাকা মাইনেতে মিস্ত্রীর চাকরী নিলেন তিনি। "১০ ঘণ্টা খাটতাম চটকলে আর সন্ধ্যাবেলা সংগঠিত করতাম শ্রমিকদের। হিন্দীতে মজুরদের শোনাতাম রুশ বিপ্লবের কথা। 'গণবানী'র প্রবন্ধ অনুবাদ করে শোনাতাম। বেশ কিছু শ্রমিক কর্মী তৈরী হল এখান থেকে, আর পেলাম যুবককর্মী গোপাল বোসকে (এখন সি পি আই এম-এর ঐ অঞ্চলের নেতা)। ৯ মাস পরে চাকরী গেল, কিন্তু ততদিন আমি মজুরদের আস্থা অর্জন করেছি।" (সাক্ষাৎকার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)

এই সময় আমাদের যোগাযোগ হল বঙ্কিম মুখার্জি ও রাধারমণ মিত্রর সঙ্গে। তাঁরাও তখন শ্রমিক আন্দোলন করছেন। ফিলিপ স্প্র্যাটের সঙ্গে

আগেই পরিচয় হয়েছিল। স্প্র্যাটের পরামর্শে আমরা স্থাপনা করলাম 'ইয়ং কমরেডস্ লীগ', বিপ্লবী ছাত্র-যুবকদের আকৃষ্ট করার জন্য। এই সময় শুরু হল লিলুয়ার রেল ধর্মঘট। আমরা জড়িয়ে পড়লাম তাতে।" ( সাক্ষাৎকার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ )

তারপরের ঘটনা আগেই বর্ণিত হয়েছে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত ১৯২৮-এর কংগ্রেস অধিবেশনে তাঁরা সকলে মিলে যে বিশাল শ্রমিক মিছিল এনেছিলেন তার কথাও আগে বলা হয়েছে। ১৯২৯-এর ২০ মার্চ অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হল মীরাটে।

তারপর বহুবার ইংরেজের ও কংগ্রেসী সরকারের কারাগারে বন্দী থেকেছেন গোপেন চক্রবর্তী। মীরাট মামলার পর খালাস পেয়ে তিনি ট্রাম শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে হাত দেন। পার্টির প্রাদেশিক নেতৃত্বেও নির্বাচিত হন একাধিকবার। ৮৩ বছর বয়সে এখনও তিনি কথা বলেন যৌবনের উদ্দীপনা ও গভীর প্রত্যয় নিয়ে।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী গোপাল বসাকের নাম এখন খুব কম কমিউনিস্টই জানেন। অথচ ঢাকা জেলার ও বাংলাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট নেতা, সদ্যপ্রয়াত অনিল মুখার্জি লিখেছেন :

## গোপাল বসাক

"গোপাল বসাক বিখ্যাত মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের অন্যতম। তিনি ঢাকা জিলায় মজুর আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ দুঃখকষ্ট বরণ, তাঁর ত্যাগ ও নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করত। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের খাওয়া পরা, শিক্ষা প্রভৃতি সমস্যাগুলিকে তিনি আন্দোলনের প্রয়োজনের তুলনায় সত্য সত্যই তুচ্ছ গণ্য করতেন।...

তিনি বলতেন, কেবল দৌড়ে দৌড়ে এখানে ওখানে ধর্মঘট করে সামাল দিতে পারবেন না। একটা দুটো জায়গায় শ্রমিকদের স্থায়ী মজবুত ইউনিয়ন গঠন করুন। তখন শ্রমিকদের মধ্য হতেই সচেতন কর্মী বেরিয়ে আসবে, তারাই নিজেদের কারখানার দায়িত্ব নিতে পারবে। আপনারাও তখন অন্য একটা কারখানার উপর নজর দিতে পারবেন...শুধু বাইরের কর্মী দিয়ে আর কতটুকু এগোন সম্ভব?" (অনিল মুখার্জি : শ্রমিক আন্দোলনে হাতেখড়ি, কলকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ১৭-১৮)

## বই পড়তেই হবে

কর্মের সঙ্গে তত্ত্বের সমন্বয়ের ব্যাপারে গোপাল্ বসাকের প্রশংসা করে অনিল মুখার্জি আরও লিখেছেন :

"দিনরাত আমাদের অবসর থাকত না। বইপত্র তো দূরের কথা, দৈনিক পত্রিকা দেখাই কঠিন হত। এতে আমার খুবই খারাপ লাগত। গোপাল বসাক ছিলেন অসম্ভব পড়ুয়া লোক। নতুন নতুন বইয়ের কথা বলতেন। তাঁকে হিংসা হত। তিনি বললেন কাজের মধ্যেই পড়া যায় এবং পড়তে হবে।...পড়ার জন্য অবসরের আশায় অপেক্ষা করলে আন্দোলনের কর্মীরা সবাই অজ্ঞ থেকে যাবে। তাঁর এই উপদেশ আমার খুবই সাহায্যে লেগেছে।" (ঐ, পৃঃ ১৮-১৯)

ঢাকার ছেলে গোপাল বসাক, কৈশোরেই যোগ দিয়েছিলেন অনুশীলন দলে। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অন্তর্ভুক্ত হন ঢাকার বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে যেখনে সমবেত ছিল অনুশীলন দলের সেরা ও জঙ্গী তরুণ কর্মীরা। ১৯২২-এ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দূত নলিনী গুপ্ত যখন এদেশে আসেন আত্মগোপন করে, তখন ঢাকাতে তিনি আশ্রয় পান এদের মধ্যে। তাছাড়া বিপ্লবী অবনী মুখার্জিও আশ্রয় নেন ঢাকাতে, ঐ অনুশীলন দলের সহযোগিতাতেই।

## ঢাকাতে কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর সূচনা

ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট পার্টির আর একজন নেতা এ সম্বন্ধে লিখছেন : "ঢাকায় থাকা অবস্থায় বেশ কিছু বিপ্লবী কর্মী এই দুই জনের সংস্পর্শে আসেন এবং রুশ বিপ্লব ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখ হইতে অনেক কথা শুনেন। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন কর্মী তখন অনুশীলন দল ছাড়িয়া কমিউনিজম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঢাকার গোপাল বসাক, নলীন্দ্র সেন (পদ্মা)-এর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ঢাকায় ১৯২৬ সাল হইতে কমিউনিজমকে ভিত্তি করিয়া কিছু সংগঠন দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন। নলীন্দ্র সেন কলিকাতায় থাকিয়া পড়িতেন এবং সেখানে ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হন। গোপাল বসাক ঢাকায় থাকিতেন এবং তিনি বিশেষ করিয়া জিলার বিভিন্ন

জায়গায় শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিতেন।” (জ্ঞান চক্রবর্তী : ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ, ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ ৫)

ঐ বইটিতে আরও লেখা হয়েছে “১৯২৭ সালে বিভিন্ন বিপ্লবী গ্রুপগুলির মিলিত চেষ্টায় ঢাকায় একটি যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গোপাল বসাক ইহাতে বেশ উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং তাঁহারই চেষ্টায় সম্মেলনের দুইটি বিভাগে সভাপতিত্ব করার জন্য কমরেড মুজফ্ফর আহামদ এবং ডঃ ভূপেন দত্ত আমন্ত্রিত হন।…ঢাকার যুব সম্মেলনে ডঃ ভূপেন দত্ত ও কমরেড মুজফ্ফর আহমদের ভাষণে স্বাধীনতা সংগ্রামের মার্কসবাদী বিশ্লেষণ হাজির করা হয়। কমরেড মুজফ্ফর আহমদ বিশেষ করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে শ্রমিক ও কৃষকদের ভূমিকার উপর যে আলোকপাত করেন, তাহা ঢাকার যুবক ও বিপ্লবীদের সামনে একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গী তুলিয়া ধরে।

## ঢাকাতে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট

১৯২৮ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ফিলিপ স্প্র্যাট গোপাল বসাকের উদ্যোগে একবার ঢাকায় আসেন এবং কিছুদিনের জন্য এখানে থাকেন। বিপ্লবী কর্মীদের অনেকে তাঁহার সহিত দেখা করেন।…১৯২৮ সালেই গোপাল বসাকের নেতৃত্বে ঢাকেশ্বরী মিলে কয়েকদিনের জন্য একটি ধর্মঘট হয়। এতদঞ্চলে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ইহাই প্রথম কারখানা শ্রমিকদের ধর্মঘট। যদিও এই ধর্মঘট ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল, তবুও ইহার ভিতর দিয়া শ্রমিক ও পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসী এবং নারায়ণগঞ্জ সহরবাসীর মধ্যে কিছুটা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই ধর্মঘটের ফলে কমিউনিজম যে একটা শক্তি তাহা বেশসংখ্যক সন্ত্রাসবাদী কর্মী এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসাবে প্রকাশ হইয়াছিল।

তখন পর্যন্ত এখানে কোনও পার্টি সংগঠন গড়িয়া ওঠে নাই, শ্রমিকরাও কোনও সংগঠন গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। গোপাল বসাক তাঁহার মুষ্টিমেয় সহকর্মীর সাহায্যে শ্রমিকদের সহিত কিছুটা ব্যাপক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার জনপ্রিয়তাও খুব বাড়িয়া যায়।… তাহার ফলে একটা ব্যাপক সংখ্যক বিপ্লবী কর্মীর মধ্যে কমিউনিজমকে

জানিবার জন্য একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়। গোপাল বসাক ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হইয়া যান ··· ।" (ঐ, পৃঃ ৫৭)

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রধান আসামী, মুজফ্‌ফর আহমদের পরিচয় অবশ্য প্রায় সবারই জানা আছে। ভারতবর্ষে এই শতাব্দীর বিশের দশকের সূচনায় মুষ্টিমেয় যে কয়জন মানুষ নিঃসঙ্কোচে কমিউনিস্ট মতবাদকেই জীবনের ধ্রুবতারা বলে মেনেছিলেন ও সমস্ত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও, এদেশের মাটিতে লাল ঝাণ্ডা প্রোথিত করেছিলেন, মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁদেরই অন্যতম।

রুশ বিপ্লবের প্রভাব অনিবার্যভাবেই ভারতে এসে পড়েছিল। আতঙ্কিত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ১৯২১-এ লিখল: "এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে রাশিয়াতে বলশেভিক শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব অন্যান্য দেশে বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনা করছে। এটা ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য, কেননা বলশেভিকদের রাজত্ব তো আমাদের ঘরের পাশেই।" (ভারতে বলশেভিকবাদ: কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের পরিচালকের গোপন রিপোর্ট, জানুয়ারি ১৯২১)

## মুজফ্‌ফর আহমদ

গোয়েন্দা দপ্তরের আতঙ্ক সত্ত্বেও, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলা তখন খুবই কঠিন কাজ ছিল। কারণ এক দিকে সাম্রাজ্যবাদী দমন-পীড়ন, অন্যদিকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সন্দেহ ও সমালোচনা—তারই মধ্যে এদেশে কমিউনিস্ট আদর্শ প্রচার করতে হয়েছে। মুজফ্‌ফর আহমদ নিজেই এ বিষয়ে লিখেছেন:

"সজাগ পাহারা ও আটঘাট বাঁধা অবস্থায় আমরা কয়েকটি লোক ভারতের কয়েকটি জায়গায় একটি কঠোর কাজে হাত দিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষেও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলব। এটা ১৯২১ সালের শেষভাগের কথা। কলকাতা, বোম্বে ও লাহোরকে কেন্দ্র করে আমাদের কাজ শুরু হল। ১৯২২ সালের শুরুর দিকে প্রথমে কমরেড আবদুর রাজ্জাক খান এবং পরে কমরেড আবদুল হালিম আমার সঙ্গে কাজে যোগ দিলেন। বোম্বের কথা বলতে হলেই প্রথমেই কমরেড শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গের কথা বলতে হবে। ১৯২২ সালে "সোস্যালিস্ট" নাম দিয়ে একখানা ইংরেজি সাপ্তাহিক ডাঙ্গে বের

করেছিলেন। তার আগে "সোস্যালিস্ট" নাম দিয়ে ভারতবর্ষে কেউ কখনও কোনও কাগজ বের করেন নি।" (মুজফ্‌ফর আহমদ: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ, পৃঃ ১১-১২)

## কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা

কলকাতায় মুজফ্‌ফর আহমদ, বোম্বাইয়ে ডাঙ্গে, মাদ্রাজে সিঙ্গারাভেলু, লাহোরে আবদুল মজিদ—এই সামান্য কটি লোক ও তাঁদের মুষ্টিমেয় বন্ধুদের কাজকর্ম দেখেই সাম্রাজ্যবাদ "লাল জুজুর" ভয়ে সন্ত্রস্ত হল এবং ১৯২৩-এ মুজফ্‌ফর আহমদ, ডাঙ্গে, নলিনী গুপ্ত, শওকৎ উসমানি প্রমুখকে গ্রেপ্তার করে, ১৯২৪-এর মার্চ মাসে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করল। এই মামলায় কমিউনিস্ট বন্দীদের নানানভাবে উৎপীড়িত করা হয়। তার বর্ণনা দিয়ে মুজফ্‌ফর আহমদ লিখছেন: "গলায় লোহার হাঁসুলি ও পায়ে লোহার মল পরিয়ে আমাদের চারজনকে চার বিভিন্ন জেলে বদলী করে দেওয়া হল। ফলে আমরা বাহিরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম।" (মুজফ্‌ফর আহমদ: ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগ, পৃঃ ১৭)

প্রচণ্ড দমনপীড়ন সত্ত্বেও কমিউনিস্ট আন্দোলন ধ্বংস হল না। ১৯২৫-এর ডিসেম্বরে কানপুরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কমিউনিস্টরা এসে সম্মেলন করে গঠন করলেন "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি।" তার সম্পাদক হলেন বোম্বাইয়ের সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে। বোম্বাই হল প্রধান কেন্দ্র, আর শাখা স্থাপিত হল কানপুর, লাহোর, মাদ্রাজ ও কলকাতায়।

## ঐক্য গড়ার আহ্বান

মুজফ্‌ফর আহমদ তখন গুরুতর অসুস্থ ও সেইজন্য কারামুক্ত। ঐ সম্মেলন থেকে তাঁর উপরই বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়বার ভার দেওয়া হয়েছিল। বহু অসুবিধা ও দৈহিক কষ্ট সত্ত্বেও, অসুস্থ মুজফ্‌ফর এই আবেদনে সাড়া দেন এবং কমিউনিস্ট মতাবলম্বী সবাইকেই পার্টির পতাকার নীচে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তিনি লেখেন: "বাংলায় যাঁরা কমিউনিস্ট আছেন, তাঁরা সমবেত হয়ে পার্টি গঠন করুন, এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আমি তাঁদের জানাচ্ছি।" (লাঙ্গল, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি, ১৯২৬)

কলকাতায় ফিরে মুজফ্‌ফর আহমদ যোগ দিলেন শ্রমিক ও কৃষক দলে। এই দশকেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য মোর্চা হল। দলের মুখপত্রের নাম "লাঙল" থেকে বদলে "গণবাণী" করা হল এবং তার নতুন সম্পাদক হলেন মুজফ্‌ফর আহমদই।

ঝরঝরে বাংলায় প্রবন্ধ লিখতেন মুজফ্‌ফর আহমদ। বন্ধু নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু'তে 'দ্বৈপায়ন' ছদ্ম নামে প্রবন্ধ লিখতেন তিনি। ১৯২২-এ লেখা তেমনই একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

## "ধূমকেতু"তে প্রবন্ধ

"কৃষকেরা প্রাণপাত পরিশ্রম করে আমাদের খাদ্যদ্রব্য তৈরী করে দিলে তবে আমরা খেয়ে বাঁচি। আর মজুরেরা কারখানা থেকে ব্যবহার্য নানা দ্রব্য প্রস্তুত করে দিলে, তবেই সকলের সংসার যাত্রা নির্বাহ হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য সৈন্য সংগ্রহও করা হয়ে থাকে এই দু'শ্রেণীরই লোকের মধ্য থেকে। সংখ্যায় ওরা বেশী, বোধ হয় শতকরা ৮০ জনেরও উপরে। মোট কথা এই যে দুনিয়ারূপে মেশিনটা চলছে এটার সমস্ত কলকব্জাই কৃষক ও শ্রমিকদের হাতে। ওরা চালালে, তবে এ মেশিন চলবে, আর না চালালে একদিনেই বন্ধ হয়ে যাবে। ওরাই দেশের শক্তি।" (ধূমকেতু, ১৩ অক্টোবর ১৯২২)

আবার ঐ ১৯২২-এর 'ধূমকেতু'তেই মুজফ্‌ফর আহমদ ধারাবাহিক-ভাবে 'মহাত্মা গান্ধী' নামে গান্ধী জীবনী লিখে, গান্ধীজির যথেষ্ট প্রশংসাও করেছেন।

১৯২৮-এ হাওড়ার মেথর ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেন প্রভাবতী দাসগুপ্তা ও মুজফ্‌ফর আহমদ। গোপাল বসাকদের আমন্ত্রণে তিনি ঢাকাতে গিয়ে সমাজতন্ত্রের সপক্ষে বক্তৃতা করেন। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতৃত্বের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল, বিশেষত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে। ফলে প্রায় অনিবার্যভাবে ১৯২৯-এর ২০ মার্চ গ্রেপ্তার করে সরকার তাঁকে পরিণত করল মীরাট মামলার প্রধান আসামীতে।

মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মানুষ ধরণী গোস্বামী। এখন তাঁর বয়স ৮৬। নিতান্ত কিশোর বয়সেই ১৯১৫-তে তিনি যোগ দেন বিপ্লবী

অনুশীলন দলে। ১৯১৭-র নভেম্বরে রুশ বিপ্লবের পর, যে সব তরুণ বিপ্লব-বাদী সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হন, ধরণী গোস্বামী তাঁদের অন্যতম।

## ধরণী গোস্বামী

কিভাবে তাঁর মত পরিবর্তন হল, তার বর্ণনা ধরণী গোস্বামী নিজেই করেছেন:

"১৯২১-২২-এ ভারতে কমিউনিস্ট পত্র পত্রিকা বেশ আসতে শুরু শুরু করল। তখন যেসব পত্র-পত্রিকা আমি পড়েছি, তার মধ্যে ছিল 'ভ্যানগার্ড', 'অ্যাডভান্সগার্ড' ও 'ইনপ্রেকর'। তাছাড়া পড়েছি এম এন রায়ের লেখা বই ও পুস্তিকা 'ইণ্ডিয়া ইন ট্রানজিশন', 'আফ্‌টারম্যাথ অব নন কোঅপারেশন" ইত্যাদি। রায় এই সব বই ও পত্রিকা ব্যাপকভাবে বিদেশ থেকে ডাকে পাঠাতেন যাবতীয় জাতীয় নেতার ঠিকানায় আর আমরা সেখান থেকেই এগুলি সংগ্রহ করে পড়তাম। তাছাড়া 'শঙ্খ' পত্রিকাতে রুশ বিপ্লব ও লেনিনের উপর প্রবন্ধ লিখতেন বিপ্লবী শচীন সান্যাল ও অমূল্য অধিকারী, ছদ্মনামে অবনী মুখার্জীও। আমি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম" (আলি আশরাফ এবং জি এ সাইওমিন সম্পাদিত 'অক্টোবর রেভল্যুশন অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়াজ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স' দিল্লী, ১৯৭৭, পৃঃ ৬৭-৬৮)।

এর আগেই আমরা দেখেছি যে নলিনী গুপ্তর সঙ্গে যোগাযোগ হয় গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, গোপাল বসাক প্রমুখর। সেই যোগাযোগের ফলে খালাসীর ছদ্মবেশে সোভিয়েত রাশিয়াতে পাড়ি দেন গোপেন চক্রবর্তী, অংশ নেন কমিণ্টার্ণের পঞ্চম কংগ্রেসে। সেখান থেকে—গোপেন্দ্র ভারতে ফেরেন ১৯২৫-এ। দেশে ফিরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে আশ্রয় দেন তাঁর পুরানো বন্ধু ধরণী গোস্বামী।

ধরণী গোস্বামী এ বিষয়ে নিজেই লিখছেন: "১৯২৫ এ পুলিস গোপেনকে খুবই খোঁজাখুঁজি করছিল। আমরাও গভীর উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম, কবে গোপেন আসবে। কলকাতায় কয়েকদিন থেকে গোপেন চলে গেল ঢাকাতে, সংযোগ স্থাপন করল অনুশীলন দলের পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে। তারপর মণি সিংহের সাহায্যে গারো পাহাড়ের নীচে তাঁর নিরাপদ আস্তানার ব্যবস্থা করা হল। সেখান থেকে তাকে নিয়ে এলাম আমার বাড়িতে, আমার মায়ের যত্নে সে সেরে উঠল।…কিছুদিনের মধ্যেই আমরা

কয়েকজন অনুশীলন দলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করে গোপেনের রিপোর্টের ভিত্তিতে গড়ে তুললাম একটি কমিউনিস্ট গ্রুপ। কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের এই প্রথম যুগে যাঁরা এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা হলেন গোপেন চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, নলীন্দ্র সেন, আশু রায়, রাসবিহারী মুখার্জী, প্যারীমোহন দাস, নীরদ চক্রবর্তী ও আমি" ( ঐ, পৃঃ ৬৯-৭০ )।

## কমিণ্টার্ণের সঙ্গে সংযোগ

কানপুরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে কেন যোগ দিলেন না ধরণী গোস্বামীরা? ঐ একই প্রবন্ধে ধরণী গোস্বামী বলছেন যে তার কারণ এম এন রায়ের কাছ থেকে তাঁরা এ বিষয়ে কোনও স্পষ্ট নির্দেশ পান নি। তাঁরা চেষ্টা করলেন কমিণ্টার্ণের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে। মণি সিং বন্যপ্রাণী সার্কাসে কেনা-বেচার জন্য একটি কোম্পানী খুলে, তার মারফৎ বার্লিনে অবস্থিত ডঃ প্রভাতী দাশগুপ্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। কমিউনিস্ট মতবাদের বই ও পত্র পত্রিকা আসত কলকাতার বিখ্যাত বইয়ের দোকান "বুক কোম্পানী"তে (যেখানে এখন মনীষা গ্রন্থালয় ) এবং নীরদ চক্রবর্তী ও প্যারীমোহন দাস সেগুলি বিতরণের ব্যবস্থা করতেন। একইভাবে ঢাকায় বই পাচার করা হত অ্যালবার্ট লাইব্রেরি মারফৎ, যার মালিক ছিলেন গোপাল বসাকের বাবা। তাছাড়া ব্যবস্থা ছিল খালাসীদের মারফৎও। ( ঐ, পৃঃ ৭১ )

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস পার্টি গঠিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছেন মুজফ্‌ফর আহমদ ও আবদুল হালিমের মত একনিষ্ঠ কমিউনিস্টরা, হেমন্ত সরকার, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বামপন্থী জাতীয়তা-বাদীরা এবং নরেশ সেনগুপ্তর মত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিরা। এম এন রায় গোপেন্দ্র-ধরণীদের গোষ্ঠীকে চিঠি লিখে পরামর্শ দিলেন, তাঁদের গ্রুপটি ভেঙে দিয়ে মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে একত্রে কমিউনিস্ট পার্টি গড়তে। সেই পরামর্শে সাড়া দিয়ে তাঁরা যোগ দিলেন ওয়ার্কার্স ও পেজাণ্টাস পার্টিতে এবং হাত লাগালেন কমিউনিস্ট সাপ্তাহিক 'গণবাণী' পরিচালনার কাজে।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে শ্রমিক সংগ্রামের জোয়ার এল। পূর্বেই বর্ণিত লিলুয়া রেল ধর্মঘটের অন্যতম প্রধান সংগঠক হলেন ধরণী গোস্বামী। পরে

চটকল ধর্মঘটেও তিনি সক্রিয় ছিলেন। বার্লিন থেকে দেশে ফিরে প্রভাবতী দাশগুপ্তও এঁদের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনে হাত লাগালেন, নেতৃত্ব দিলেন প্রথমে কর্পোরেশনের ধাঙড় ধর্মঘটের ও পরে ১৯২৯-এর প্রথম চটকল সাধারণ ধর্মঘটে।

## ইয়ং কমরেডস্ লীগ

ইতিমধ্যে ধরণী গোস্বামী তরুণ বিপ্লববাদীদের কমিউনিস্ট আদর্শের দিকে টানবার জন্য গঠন করলেন কলকাতায় এক যুব সংগঠন "ইয়ং কমরেডস্ লীগ"। এখানে এসে বহু আলোচনাচক্র পরিচালনা করেন ইংরেজ কমিউনিস্ট ফিলিপ স্প্র্যাটও। বহু তরুণ বিপ্লবী যাঁরা তখনও তাঁদের পুরানো মত এবং পথও পরে পরিত্যাগ করেন নি, আবার শ্রমিক সংগ্রাম ও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের আদর্শের দ্বারাও যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়েছেন, তাঁরা নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন ইয়ং কমরেডস্ লীগের দপ্তরে। এঁরাই পরে সেতুর কাজ করেছেন কারান্তরালে হাজার হাজার বিপ্লববাদীর সাম্যবাদে উত্তরণে। সরকারী গোয়েন্দা দপ্তর এদের বলত টেরো-কমিউনিস্ট।

১৯২৯-এর ২০ মার্চ অন্যান্যদের সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়ে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী হলেন ধরণী গোস্বামীও। মীরাট মামলার কথা স্মরণ করে বহু বছর পরে তিনি লিখেছেন :

"দীর্ঘ বন্দীদশায় আদালতকক্ষকে আমরা রূপান্তরিত করেছিলাম সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের আদর্শ প্রচারের প্ল্যাটফর্মে মীরাট জেলখানা হয়ে উঠল মার্কসবাদ চর্চার একটা ছোটখাট বিশ্ববিদ্যালয়। একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে এই মামলাতে আমাদের প্রচারের ফলে দেশের যুবসমাজ কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে যতটা জানতে পারলেন, আগে তার অর্ধেকও জানতেন না।" (ঐ, পৃঃ ৮২)

৮৬ বছর বয়সেও ধরণী গোস্বামী এখনও সক্রিয়, কমিউনিস্ট আদর্শে অবিচল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদের কন্ট্রোল কমিশনের তিনি সভাপতি। তরুণ বয়সে যে লালঝাণ্ডা তিনি হাতে তুলে নিয়েছেন, তা আজও ধরা আছে তাঁর শক্ত মুঠোয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন সামসুল হুদা। আজ খুব অল্প লোকেই তাঁকে মনে রেখেছেন, কিন্তু তিনি একেবারে প্রথম যুগের

একজন খুবই উল্লেখযোগ্য কমিউনিস্ট। ছোটখাটো মানুষটি, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রেণী-শত্রুর বিরুদ্ধে ক্রোধ তাঁর মধ্যে সবসময় টগবগ করত। ইংরেজের বা ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করতে উঠলেই হুদা সাহেবের মুখ থেকে অগ্নিস্রাবী ভাষা বেরত এবং তার ফলে হরদমই তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হত রাজদ্রোহাত্মক বক্তৃতাদানের অপরাধে।

## সামসুল হুদা

গরীব ঘরের ছেলে সামসুল হুদা। নাবিকের চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে তিনি পাড়ি দেন কৈশোরেই সুদূর আমেরিকাতে। সেখানে কিছুদিন পরে তিনি চাকরী পেয়ে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটরগাড়ি তৈরীর জন্য প্রসিদ্ধ সহর ডেট্রয়টে। এই ডেট্রয়টেই তাঁর পরিচয় হয় আর এক তরুণের সঙ্গে—তাঁর নাম আমীর হায়দর খাঁ। তিনিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন জীবিকার সন্ধানে। সেখানে তিনি জড়িত হয়ে পড়েন শ্রমিকদের সংগ্রামে। সাহসী যুবক, শ্রেণীসংগ্রামে তাঁর দৃঢ়তা দেখে, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন নবগঠিত আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা। তাঁদের প্রভাবেই কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হন আমীর হায়দার খাঁ। আর তার প্রভাবে কমিউনিজমের দিকে আকৃষ্ট হন তরুণ সামসুল হুদা।

## আমেরিকা থেকে সোভিয়েত দেশে

বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র সোভিয়েত রাশিয়াতে যাবার জন্য তাঁকে উৎসাহিত করেন আমীর হায়দর। নাবিকের চাকরী নিয়ে, বহু বিপদ পেরিয়ে, বহু দমনপীড়নকে অগ্রাহ্য করে তরুণ সামসুল হুদা পৌঁছে যান ১৯২৫-২৬-এ তাঁর তীর্থক্ষেত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেখান থেকে তিনি ফিরে আসেন ভারতবর্ষে, কলকাতায়—যোগ দেন মুজফ্ফর আহমদ, আবদুর রেজ্জাক খাঁ ও আবদুল হালিমের সঙ্গে নবজাত কমিউনিস্ট পার্টিতে। ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস পার্টিরও তিনি একজন সংগঠক হয়ে ওঠেন এবং ১৯২৮-এ কলকাতায় অনুষ্ঠিত ওয়ার্কার্স ও পেজান্টস পার্টির প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দাবী করে প্রস্তাবটি তিনিই উত্থাপন করেন। ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদিত ডকুমেন্টস অব দি হিস্ট্রি অব দি কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া (১৯২৮) থেকে জানতে পারা যায় যে ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গোপন অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন ৩ জন কমিউনিস্ট—মুজফ্‌ফর আহমদ, আবদুল হালিম ও সামসুল-হুদা। তার অল্পদিনের মধ্যেই বন্দী হয়ে তিনি চালান হ'ন মীরাটে।

## শউকৎ উসমানি

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার একজন সবচেয়ে পরিচিত আসামী ছিলেন শউকৎ উসমানি। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দারা ফেউয়ের মত সবসময়েই তাঁর পিছনে লেগে থাকত। উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা শউকৎ উসমানি প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঘৃণা থেকে চলে গিয়েছিলেন দেশ ছেড়ে কাবুলে। সেখান থেকে তিনি গেলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে। যোগ দিলেন প্রাচ্য দেশের শ্রমজীবীদের জন্য গড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হিসাবে। তার পর ডানপিটে কমিউনিস্ট হিসাবে ফেরারী হয়ে দেশে ফিরলেন আফগানিস্তানের পথে।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ তখন আফগান সীমান্ত দিয়ে আসা তরুণদের একধার থেকে গ্রেপ্তার করে চলেছে কমিউনিস্ট সন্দেহ করে, সংগঠিত করছে একাধিক বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা পেশোয়ারে। ধরা পড়লেন শউকৎ উসমানিও প্রধান আসামী হতেন কোনও একটি পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলাতে, মিঞা আকবর শাহ্‌ কি ফজল ইলাহি কুরবানের মত। সে যাইহোক, পুলিসের শ্যেন চক্ষুকে এড়িয়ে শউকৎ উসমানি যোগাযোগ করেন এদেশের জাতীয়তা-বাদী নেতৃত্বের একাংশ ও তৎকালীন মুষ্টিমেয় কমিউনিস্টদের সঙ্গে।

## জেলে অকথ্য অত্যাচার

তবে শেষ পর্যন্ত ১৯২৩-এ ধরা পড়ে গেলেন শউকৎ উসমানি। তাঁকে এবং ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহমদ ও নলিনী গুপ্তকে নিয়ে শুরু হল প্রসিদ্ধ কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা। গ্রেপ্তারের পর অকথ্য অত্যাচার হয় শউকৎ উসমানির উপর। জেল থেকে বেরিয়ে উসমানি একটি বই লেখেন "পেশোয়ার থেকে মস্কো।" সেই বইয়ের মুখবন্ধে ফিলিপ স্প্র্যাট লিখছেন:

"বন্দী অবস্থায় উসমানিকে পাঠানো হয় প্রথম পেশোয়ার থেকে ১৫ মাইল দূরে একটা গ্রামে সেখান থেকে রোজ একজন পুলিস কর্মচারী তাঁকে ডাণ্ডা বেড়ি পরিহিত অবস্থাতে হাঁটিয়ে নিয়ে আসত পেশোয়ার পর্যন্ত। ফলে তাঁর

পা কেটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। এইসব অত্যাচারের খবর সংবাদপত্রে ফাঁস হয়ে যাবার পর, উসমানির উপর জুলুম বন্ধ হয়। ১৯২৪-এর মে মাসে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ১৯২৭-এর আগস্টে যখন তিনি মুক্তি পেলেন, তখন কর্তৃপক্ষ তাঁকে তাঁর কোনও জিনিসপত্র ফেরৎ দিল না, এমনকি তাঁর চশমাটিও না।" (ডঃ অধিকারী সম্পাদিত ডকুমেন্টস, তৃতীয় বি খণ্ড, পৃঃ ২২৬)

কারামুক্ত হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে উসমানি চলে গেলেন সোভিয়েত রাশিয়াতে, সিকান্দার শূর ছদ্মনামে যোগ দিলেন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে। সেখানে অবশ্য উসমানি কমিন্টার্ণের তৎকালীন নেতৃত্বে সংকীর্ণতাবাদী মূল্যায়নের উৎসাহী সমর্থকে পরিণত হলেন এবং ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টিদের ভূমিকাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে ষষ্ঠ কংগ্রেসে বক্তৃতা করলেন। (ইনপ্রেকর, ৮ নভেম্বর ১৯২৮) অপর ভারতীয় প্রতিনিধি নারায়ণ (সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) অবশ্য ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টির ইতিবাচক ভূমিকাকে সমর্থন করে, কমিউনিস্ট নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চায় এই দলের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে বক্তৃতা করেন। (ইনপ্রেকর, ৩০ অক্টোবর ১৯২৮)।

১৯২৯-এর সূচনায় দেশে ফেরেন শউকৎ উসমানি এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে চালান করে দেয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়।

এবার যে মীরাট বন্দীর কথা আমরা আলোচনা করব তাঁর নাম আবদুল মজিদ—লাহোরের অধিবাসী। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের অল্প কথায় জানতে হয় সেই সব শত শত বীর মুসলমান যুবকের কথা, যাঁরা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের গোলাম থাকতে অস্বীকার করে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের মধ্যে ও তারপরে উত্তর ভারত থেকে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়াতে চলে যান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের হাতে প্রাণ হারান তাঁদের অনেকেই। তাঁদের প্রথম দিকের লক্ষ্য ছিল আনাতোলিয়ায় পৌঁছে তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়া।

## মীর আবদুল মজিদ

পরে তাঁরা আকৃষ্ট হন রুশ বিপ্লবের দিকে। মস্কো থেকে তাসখন্দে

চলে এসে এম এন রায়ও যোগাযোগ করেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে কাবুল মারফৎ। এমনই একটি তরুণের দলের সঙ্গে এসেছিলেন লাহোরের আবদুল মজিদ।

১৯২১-এর ২১ এপ্রিল মস্কোতে স্থাপিত হয় "প্রাচ্যের শ্রমজীবীদের জন্য কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়।" তাসখন্দে ভারতীয় বিপ্লবীদের যে সামরিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছিল সেখান থেকে ২২ জন ভারতীয়কে ছাত্র হিসাবে পাঠানো হল ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

তাঁদের মধ্যে ছিলেন শওকৎ উসমানি, ফজল ইলাহি কুরবান, ফিরোজুদ্দিন মনসুর, মীর আবদুল মজিদ এবং আরও অনেক—বেশীর ভাগই লাহোর বা পেশোয়ারের অধিবাসী। ১৯২১-এর অক্টোবরে এম এন রায়, অবনী মুখার্জি প্রমুখর উদ্যোগে তাসখন্দে ৭ জনের যে "ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি" গঠিত হয় তাতে যোগ দেন এই ছাত্রদের কেউ কেউ, মস্কোতে আসার পর। ভূপালের রফিক আহমদ, যিনি লড়াই করেছেন লালফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে সেই যুগে, তিনি বহু বছর পরে মুজফ্‌ফর আহমদকে বলেন:

## প্রবাসে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান

"প্রথমে শওকৎ উসমানি পার্টিতে যোগ দিলেন। তারপর একসঙ্গে পার্টিতে যোগ দিলেন গওহর রহমান খান, মিঞা মহম্মদ আকবর শাহ ও ও সুলতান মাহমুদ। তারও পরে মীর আবদুল মজিদ, ফিরোজুদ্দিন মনসুর ও ফিদা আলি জাহিদ পার্টিতে এলেন। তাঁদের অনুসরণ করলেন রফিক আহমদ ও হাবীব আহমদ নসীম। তার কিছু পরে পার্টিতে এলেন ফজল ইলাহী কুরবান ও আবদুল্লা সফদর..." (মুজফফর আহমদ: প্রবাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন, পৃঃ ৩১)

শ্রমজীবীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরা কি পড়তেন, কারা পড়াতেন, সেবিষয়ে 'মেইনস্ট্রীম' পত্রিকাতে তাঁর ধারাবাহিক রচনাতে শওকৎ উসমানি চিত্তাকর্ষক স্মৃতিচারণ করেছেন (মেইনস্ট্রীম, ২২ জুলাই ও ৫ আগস্ট, ১৯৫৭)। তিনি লিখছেন যে, তাঁকে আবদুল মজিদকে ও আর একজনকে "অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে পাঠ নিতে হয়েছিল। তাঁদের ক্লাস নিতেন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ফিণবার্গ, ইংরেজ কমিউনিস্ট ইস কোয়েলশ,

বোরোডিন…। যাঁরা ক্লাসে বক্তৃতা দিতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন বুখারিন, রাডেক ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের আরও অনেক নেতা।"

## লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ

রফিক আমেদ তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন যে একদিন ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন স্বয়ং লেনিন। জ্বর থাকায় রফিক যেতে পারেননি, অন্য ছাত্ররা গেলেন। ফিরে এসে তাঁরা রফিককে বললেন: "জানো, আমরা এখানে যে চা খাই, লেনিন ও তার বন্ধুরাও সেই একই ধরণের চা খান, অর্থাৎ শুকিয়ে নেওয়া আপেল পাতার চা। তাঁরা বিনা দুধ চিনিতেই চা খান। আমি আমার বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করলাম: কিন্তু লেনিন কি বললেন তোমাদের? তারা বললেন: লেনিন আমাদের বলেছেন, এখানে শেখার প্রত্যেকটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন। শুধু—বই থেকে শেখা নয়। জনগণ কিভাবে বিপ্লব ঘটাচ্ছে সেটা দেখুন। যখন আপনারা ভারতে ফিরে যাবেন তখন শুরু করবেন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রাম।" (সোভিয়েত দেশ, ২১ নং, নভেম্বর ১৯৬৬)।

## পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা

লেনিনের উপদেশকে মাথায় নিয়ে দফায় দফায় আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে ফেরার চেষ্টা করলেন ১৯২২ থেকেই এই বিপ্লবী ছাত্ররা। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দা-জাল এড়িয়ে ২।৪ জন শউকৎ উসমানির মত ভারতে ঢুকে পড়তে পারেন। আর বেশীর ভাগকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজরা দফায় দফায় চালু করে পেশোয়ার বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা। তারই একটি মামলায় বন্দী হন লাহোরের মীর আবদুল মজিদ, তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় তার (গঙ্গাধর অধিকারী সম্পাদিত ডকুমেন্টস অব দি হিস্ট্রি অব কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া, দ্বিতীয় খণ্ড)।

১৯২৫-এর ডিসেম্বর মাসে যখন কানপুরে ভারতের মাটিতে ভারতের কমিউনিস্টদের প্রথমে জাতীয় সম্মেলনকে সমর্থন জানিয়েছিলেন অন্যান্যদের সঙ্গে মীর আবদুল মজিদ। লাহোরে তার সহকর্মীদের কেউ কেউ যোগও দিয়েছিলেন কানপুর সম্মেলনে। "ডকুমেন্টস্" থেকে দেখা যাচ্ছে যে

কানপুর সম্মেলন পেশোয়ার বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার সমস্ত বন্দীদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে একটা প্রস্তাবও নিয়েছিলেন।

## ১৯২৬ লাহোরে মে দিবস

১৯২৬-এ কারামুক্ত হয়েই মীর আবদুল মজিদ চলে গেলেন লাহোরে এবং সেখানে শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সেখানের টাঙ্গাচালকদের মধ্যে তিনি গড়ে তোলেন শক্তিশালী ইউনিয়ন। ১৯২৬-এর মে দিবসে মীর আবদুল মজিদের নেতৃত্বে কয়েক শত টাঙ্গাচালক লালঝাণ্ডা হাতে লাহোরের রাজপথে মিছিল করে মে দিবস পালন করে। ভারতে মে দিবস পালনের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

১৯২৮-এ লাহোর থেকে একটি সাম্যবাদী উর্দু সাপ্তাহিক প্রকাশ করতে থাকেন আবদুল মজিদ তার নাম "মেহনৎকশ"। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র যে গোপন অধিবেশন হয়, তাতে পাঞ্জাব থেকে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন দুজন—আবদুল মজিদ ও সোহন সিং যোশ (অধিকারী সম্পাদিত ডকুমেন্টস্, তৃতীয় সি খণ্ড)। এর পরই ১৯২৯-এর ২০ মার্চ তাকে গ্রেপ্তার করে ইংরেজ সরকার চালান করেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম বন্দী হিসাবে।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুসলিম বিপ্লবীদের সেরা সন্তানেরা যেমন ক্রমেই গ্রহণ করেছিলেন কমিউনিস্ট আদর্শ (শউকৎ উসমানি, আবদুল মজিদ, মিঞা আকবর শাহ্), তেমনই শিখ বিপ্লবীদের অনেকেই আকৃষ্ট হতে শুরু করেছিলেন রুশ বিপ্লব ও সাম্যবাদের দিকে। ১৯২০-তেই সোভিয়েত দেশে হাজির হয়েছিলেন দলীপ সিং গিল। পরে ১৯২৭-এ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘের ব্রুসেলস অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন তেজা সিং স্বতন্ত্র। সর্দার ভগৎ সিং নিজেই ঝুঁকেছিলেন সাম্যবাদের দিকে—বর্ষীয়ান গদর বিপ্লবী বাবা পৃথ্বী সিংকে আজাদকে তিনি জেল থেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন রুশ বিপ্লবের দেশে যেতে। পৃথ্বী সিং সে অনুরোধ জানিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর আজাদ—এই দুই বিপ্লবীরই মাথার উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছে তখন। ধরা পড়লে মৃত্যুদণ্ড ছিল প্রায় অবধারিত। সেই অবস্থাতেই প্রাণ তুচ্ছ করে পৃথ্বী সিং পাড়ি দিলেন সোভিয়েত দেশে।

## সোহন সিং যোশ

তবে সবার আগে যে শিখ বিপ্লবী যোগ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিতে, তাঁর নাম সর্দার সোহন সিং যোশ, মাত্র কিছুদিন আগে শুরু হয়েছে যাঁর অর্ধশতাব্দীব্যাপী কর্মময় কমিউনিস্ট জীবন।

তরুণ বয়সেই সোহন সিং যোশ আকৃষ্ট হন ভারতের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে, গদর বিপ্লবীদের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে। রুশ বিপ্লবের পর তিনি আকৃষ্ট হন সমাজতন্ত্রের দিকেও। তখন থেকে তিনি উঠে পড়ে লাগেন তরুণ সমাজকে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক আদর্শে প্রভাবিত করার জন্য। এই সময়ই তাঁর যোগাযোগ হয় তরুণ বিপ্লবী সর্দার ভগৎ সিং-এর সঙ্গে। ভগৎ সিং তখন সমাজতন্ত্রী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন কিন্তু বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পথও সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে রাজী নন। রাতের পর রাত বহু আলোচনা হয় তাঁর সোহন সিং যোশ-এর সঙ্গে।

তবে বৈপ্লবিক গণ-আন্দোলন ও গণসংগঠনের গুরুত্ব ভগৎ সিং বুঝতেন। তাই তিনি গঠন করেছিলেন "নওজোয়ান ভারত সভা" নাম দিয়ে উত্তর ভারতের যুব সমাজের এক সংগ্রামী গণ-সংগঠন। তাতে যোগ দেন সোহন সিং যোশও। একটা পত্রিকা বের করতেন ভগৎ সিং, তার নাম "কীর্তি", মানে শ্রমিক। তার সম্পাদনার ভার দিলেন তিনি সোহন সিং যোশ-এর উপর। তারপর থেকেই "কীর্তি"র পাতায় গরম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লেখার সঙ্গে, সমাজতন্ত্রের সপক্ষেও প্রবন্ধ ছাপা হতে শুরু করল।

## ভগৎ সিং-এর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী

১৯২২এ দেশ জুড়ে "সাইমন ফিরে যাও" বিক্ষোভের বড় অংশ নিল পাঞ্জাবও। লাহোর পুলিসের বড় কর্তা সণ্ডার্সে'র লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হলেন বৃদ্ধ জননায়ক লাজপৎ রায়। কিছুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর চিতাভস্ম স্পর্শ করে ভগৎ সিংরা শপথ নিলেন: খুনকা বদলা খুনসে লেঙ্গে। প্রাণ হারালো অত্যাচারী পুলিশের বড়কর্তা, ফেরার হলেন ভগৎ সিং।

ইতিমধ্যে সোহন সিং যোশ পাঞ্জাবে গড়ে তুলেছেন আধা-সাম্যবাদী দল "ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস্ পার্টি"। তার প্রতিনিধি হয়ে ১৯২৮-এর

ডিসেম্বরে তিনি এলেন কলকাতায়, ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস্ পার্টি'র প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দিতে। অন্য সকলের অনুরোধে সেই সম্মেলনে সভাপতিত্বই করলেন সোহন সিং যোশ। আর সেই সময়ই কলকাতাতে নাটকীয় পরিবেশে তাঁর শেষ বার সাক্ষাৎ হল ফেরারী বিপ্লবী ভগৎ সিং-এর সঙ্গে। তিনি সোহন সিংকে জানালেন যে মনে মনে তিনিও সাম্যবাদের সমর্থক। (সোহন সিং যোশ : সাক্ষাৎকার অক্টোবর, ১৯৭০)

## পার্টির সভ্য হলেন '১৯২৮'

ডঃ অধিকারী সম্পাদিত ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস, তৃতীয় বি খণ্ড থেকে আমরা জানতে পারছি যে ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র গোপন সভাতে সর্বসম্মতভাবে পার্টি সভ্যপদ দেওয়া হচ্ছে সর্দার সোহন সিং যোশকে। তার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ধরা পড়ে যুক্ত হলেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাতে।

১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টি'র যে সভ্যপদ পেয়েছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা চোখের মণির মত রক্ষা করেছিলেন সর্দার সোহন সিং যোশ। ১৯৮৩-তে মৃত্যুর সময়ে তিনি ছিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র কেন্দ্রীয় কন্‌ট্রোল কমিশনের সভাপতি।

বোম্বাই-য়ের সুতাকল শ্রমিকদের গৌরবময় সাধারণ ধর্মঘটে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং পরে গড়ে তুলেছিলেন তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ জঙ্গী ট্রেড ইউনিয়ন—গিড়নি কামগড় ইউনিয়ন—তাঁদের মধ্যে ছিলেন আর এস নিম্ব্‌কর, এস এ ডাঙ্গে, এস এস মীরাজকর, এস বি ঘাটে ও কে এন যোগলেকর। এরা সবাই মারাঠি এবং শতাব্দীর বিশের দশকের গোড়াতেই এঁরা যোগ দিয়েছিলেন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে এবং আকৃষ্ট হয়েছিলেন শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের প্রতি।

## এস এস মীরাজকর

এস এস মীরাজকর প্রথম থেকেই শুরু করেছিলেন শ্রমিক আন্দোলন। বোম্বাই-য়ের হোটেল শ্রমিক ইউনিয়নের একজন সংগঠক ছিলেন তিনি ১৯২০-তে। তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি : ১৯২০-তে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে একজন সাধারণ

প্রতিনিধি ছিলাম আমি। তখন থেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার লড়াই করাই হবে আমার জীবনের ব্রত। তবে তখন স্বপ্নেও ভাবিনি যে এর অর্ধশতাব্দী পরে ঐ এ আই টি ইউ সি-র সভাপতির সম্মানিত আসনে আমি নির্বাচিত হতে পারব।" (মীরাজকর: লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, কলকাতা, ১৯৭০)

## আর এস নিম্ব্‌কর

আর এস নিম্ব্‌কর ছিলেন ভাল ছাত্র ও ধারালো বক্তা। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বাধীনতার দাবীতেই হোক, আর সূতাকল শ্রমিকদের শোষণ-বিরোধী শ্রেণী সংগ্রামের তীক্ষ্ণ দাবীতেই হোক, জ্বালাময়ী বক্তৃতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন নিম্ব্‌কর। এস এ ডাঙ্গে নিজেই বলছেন: "আমাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সেরা বক্তা ছিল নিম্ব্‌কর।" (ডাঙ্গে, লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কলকাতা, ১৯৭০) সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে মীরাট বন্দীদের মিলিত বিবৃতিরও অন্যতম প্রধান রচয়িতা ছিলেন নিম্ব্‌করই। মীরাট মামলায় দণ্ডিত হয়ে কারামুক্তির পর নিম্ব্‌কর আর যুক্ত থাকেন নি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র সঙ্গে, তিনি হয়েছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতাদর্শের অনুগামী।

## কে এন যোগলেকর

রেলশ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন কে এন যোগলেকর। সূতাকল শ্রমিকদের প্রসিদ্ধ গিড়নি কামগড় ইউনিয়নের সঙ্গে তাল রেখে গড়ে উঠেছিল বাহাদুর রেল শ্রমিকদের জঙ্গী জি আই পি রেলশ্রমিক ইউনিয়ন। তারই প্রধান সংগঠক ছিলেন কে এন যোগলেকর। ১৯২৭-এ মাদ্রাজে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সম্বলিত প্রস্তাবটি বিষয় নির্বাচনী সভায় উত্থাপন করেছিলেন কে এন যোগলেকরই। তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে সমর্থন জানিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত হয়েছিল প্রস্তাবটি। (ইণ্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯২৭)

## এস এ ডাঙ্গে

এস এ ডাঙ্গে ছিলেন ছাত্র নেতা, লোকমান্য তিলকের অনুগামী। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে তিনি আকৃষ্ট হলেন মার্কসবাদের দিকে, পরিণত হলেন

সমাজতন্ত্রীতে। তাঁর নিজের ভাষায়, "ছিলাম তিলকের চেলা, হলাম লেনিনের চেলা" (লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার কলকাতা, ১৯৭০) ১৯২২-এ তিনি বই লিখলেন "গান্ধী বনাম লেনিন"। ইংরেজি ভাষাতে মাসিকপত্র ছাপলেন "দি সোস্যালিস্ট" প্রস্তাব করলেন যে ভারতের জাতীয় সমাজতন্ত্রীরা মিলে একটি বামপন্থী দল গড়ে তুলুক। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় চার বছর জেল খাটবার সময় তিনি জেলের অকথ্য অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বই লিখলেন "হেল ফাউণ্ড"। গিরনি কামগড় ইউনিয়নেরও তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান নেতা।

## এস ভি ঘাটে

সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটে ছিলেন ডাঙ্গে, যোগলেকর ও মীরাজকরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। আজ থেকে ৫৯ বছর আগে যখন এদেশে প্রথম সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মেলন হল কানপুরে এবং সেখান থেকে জন্ম পেল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, সর্বসম্মতিক্রমে তার প্রথম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন সচ্চিদানন্দ বিষ্ণু ঘাটেই। বোম্বাই সূতাকল সাধারণ ধর্মঘটের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সংগঠক।

খুবই স্বাভাবিক যে এঁদের সব কজনের উপরই শ্যেনদৃষ্টি থাকবে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের। তাই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার জালে বন্দী করে এঁদের সব কজনকেই তুলে এনেছিল ইংরেজ গোয়েন্দা প্রবররা।

গঙ্গাধর অধিকারীও মহারাষ্ট্রের সন্তান। শতাব্দীর সূচনাতে তাঁর জন্ম। প্রতিভাবান ছাত্র, বোম্বাইতে রসায়নে সাম্মানিক স্নাতক হন প্রথম শ্রেণীতে, সমান কৃতিত্ব দেখান এম এস সি পরীক্ষাতেও। তারপর ভৌত রসায়নে গবেষণা করতে জার্মানী যান। সেখানে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী ও কমিউনিস্ট ম্যাক্স ভলমারের কাছে গবেষণা করে, ৬ বছরের কাজ ৩ বছরে শেষ করে ডি এস সি ডিগ্রী অর্জন করেন গঙ্গাধর অধিকারী। তখন তাঁর টাকা-পয়সার টানাটানি চলছিল। ম্যাক্স ভলমারই বিজ্ঞান গবেষণাগারে তাঁর একটা কাজ জুটিয়ে দেন। ডঃ অধিকারীর সন্দেহ যে এর পিছনে ছিলেন স্বয়ং অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।

## গঙ্গাধর অধিকারী ও আইনস্টাইন

ডঃ অধিকারীর জীবনের শেষ দশ বছরে, ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের

ইতিহাসের দলিলপত্র সম্পাদনার কঠিন কাজে, তাঁর প্রায় নিত্যসঙ্গী ছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ। ডঃ অধিকারীর মৃত্যুর পর তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন :

"আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ কতটা ছিল, আমার এই কৌতূহলে ডঃ অধিকারী সবিনয়ে জানান যে তিনি তখন একজন তরুণ গবেষক মাত্র, আর আইনস্টাইন ছিলেন বিজ্ঞানের এক অতিকায় পুরুষ—তাঁদের ইনস্টিট্যুটের কর্ণধার তো বটেই। তাই নিয়মিত যোগাযোগের কোনও প্রশ্নই ছিল না। তবে একদিন তিনি গবেষণাগারে কাজ করছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর কাঁধে কে যেন হাত রাখলেন। তিনি ফিরে দেখেন স্বয়ং আইনস্টাইন। আইনস্টাইন সস্নেহে ও কিছুটা কৌতুকভরে বললেন, তিনি শুনেছেন একজন ভারতীয় নাকি এই ইনস্টিট্যুটে কাজ করছেন, তাই তিনি দেখতে এসেছেন ভারতীয়রা কেমন দেখতে।" (সেহানবীশ : গঙ্গাধর অধিকারী প্রসঙ্গে, 'বারোমাস', নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯৮১)

এইখানেই বলে রাখা উচিত যে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর গঙ্গাধর অধিকারীর আবার যোগাযোগ হয়েছিল তাঁর পুরানো মাস্টারমশাই ম্যাক্স ভলমারের সঙ্গে। তখন তাঁর কাছ থেকে ডঃ অধিকারী জানতে পারেন যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাতে তিনি বন্দী আছেন জেনে, ইংলণ্ডে ভারত সচিবের কাছে তাঁর মুক্তি দাবী করে পত্র পাঠিয়েছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন।

## বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে

বার্লিনে থাকার সময় গঙ্গাধর অধিকারী প্রসিদ্ধ ভারতীয় বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁরই প্রভাবে তিনি আকৃষ্ট হন মার্কসবাদের দিকে, পরে গভীরভাবে গ্রহণ করেন কমিউনিস্ট মতবাদকে। বীরেন্দ্রনাথ ও জার্মান কমিউনিস্ট উইলি মুনজেনবার্গের নেতৃত্বে যখন ১৯২৭-এ ব্রাসেলসে এক মহাসম্মেলন থেকে জন্মলাভ করে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংঘ "লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজম" তখন সেই সংগঠনে, জন্মলগ্ন থেকেই সক্রিয় ছিলেন গঙ্গাধর অধিকারীও। এই সময়ই তিনি যোগ দেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে—তাঁর সভ্যপদের দুই প্রস্তাবক ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও উইলি মুনজেনবার্গ।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন তিনি। ডঃ জাকির হোসেনের পর ডঃ অধিকারীই নির্বাচিত হন বার্লিনের "ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের" সভাপতি। ভারতের স্বাধীনতার দাবীর সমর্থনে বহু সভার আয়োজন করেন তিনি, যেখানে বক্তৃতা করতে এসেছেন মতিলাল নেহরু, মহম্মদ আলি, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের মত বহু বরেণ্য দেশনেতা এবং জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিরও অনেক নেতা।

## ভারতে ফেরার সিদ্ধান্ত

তাঁর মাস্টারমশাই চাইছিলেন যে তিনি গবেষণা কর্মেও ব্যাপৃত থাকুন। কিন্তু কমিউনিস্ট ডঃ অধিকারী সিদ্ধান্ত করলেন দেশে ফিরে ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনেই সর্বক্ষণ আত্ম-নিয়োগের। ১৯২৮-এর নভেম্বরে তিনি দেশে ফিরলেন। ঐ বছরই ডিসেম্বরে যোগ দিলেন ভারতের কমিউনিস্টদের গোপন সভায়, জানালেন যে বোম্বাইয়ের শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার কাজেই তিনি আত্মনিয়োগ করবেন। (লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ৮ মার্চ, ১৯৭৩)

এই তরুণ বিজ্ঞানী যে তাঁর সমস্ত প্রতিভাকে নিয়োগ করবেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বকে উচ্ছেদ করে স্বাধীন ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কঠিন কাজে, তা অজানা রইল না সাম্রাজ্যবাদী গোয়েন্দাদের। তাই ১৯২৯-এর ২০ মার্চ গ্রেপ্তার হলেন ডঃ অধিকারী অভিযুক্ত হলেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায়।

মীরাটের যে তিনজন বন্দীর কথা এবার আলোচনা করব তাঁরা সবাই ইংরেজ কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁরা হাত মিলিয়েছিলেন ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে—ফিলিপ স্প্র্যাট, বেন্ ব্র্যাড্লি ও লেস্টার হাচিনসন। প্রথম দুজন ছিলেন ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃস্থানীয় সদস্য আর হাচিনসন ছিলেন বামপন্থী সাংবাদিক। ভারতের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনকে সাহায্য করতে এসে এঁদেরও আগে দেড়বছর জেল খেটে গেছেন ইংরেজ কমিউনিস্ট নেতা অ্যালিসন, যাঁর ছদ্মনাম ছিল ক্যাম্পবেল। তারপর এসেছিলেন ব্র্যাড্লি ও স্প্র্যাট। ব্র্যাড্লি বোম্বাইকে ঘাঁটি করে পশ্চিম ভারতকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র বেছে নেন, আর স্প্র্যাট ঘাঁটি করেন কলকাতা তথা বাংলাদেশকে।

## ফিলিপ স্প্র্যাট

আদিযুগের একজন কমিউনিস্ট নেতা মণি সিংহ তাঁর স্মৃতিচারণে স্প্র্যাট সম্বন্ধে লিখেছেন : "ফিলিপ স্প্র্যাটের বয়স ছিল সাতাশ বছর। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিজিক্সে অনার্স (ট্রাইপোস) নিয়ে বি এ পাশ করেছিলেন। তিনি ১৯২৭ সালে কমরেড মুজফ্‌ফরের আস্তানা ২।১, ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনে উঠেন ও সেখানে দিশী খাবার খেয়ে অতি কষ্টে জীবন যাপন করতে থাকেন। তিনি নিজে স্বেচ্ছায়ই এই অবস্থা বরণ করে নেন। তিনি লিলুয়া রেলওয়ে স্ট্রাইকের এবং পরে ধাঙ্গড় ধর্মঘটের সমস্ত কাজ করেন। তাঁর চাল-চলন ছিল খুব সাদা-সিধা। তিনি 'এ কল্ টু এ্যাকশন' নামে একটি পুস্তিকাও লেখেন। ফিলিপ স্প্র্যাট মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯২৯ সালে অভিযুক্ত হন। ফিলিপ স্প্র্যাট বাইরে বা জেলে, কোনখানেই তাঁর বিপ্লবী মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেন নি…।" (মণি সিংহ : 'জীবন সংগ্রাম' ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ২২)

রাধারমণ মিত্র ও গোপেন চক্রবর্তী দুজনেই, লেখকের সঙ্গে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে একই ধরনের কথা বলেছেন। চেঙ্গাইল চটকল ধর্মঘটে স্প্র্যাট গিয়ে বক্তৃতা করায়, ধর্মঘটী শ্রমিকদের মনোবল দৃঢ় করতে সাহায্য হয়েছিল, একথাও তাঁরা বলেছেন। ১৯৭০-এ লেখককে লেখা চিঠিতে ফিলিপ স্প্র্যাটও চটকল ধর্মঘটে রাধারমণ মিত্র, বঙ্কিম মুখার্জী ও গোপেন চক্রবর্তীর ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। মীরাট বন্দীরা যৌথভাবে যে বিবৃতি রচনা করেন, তাতেও স্প্র্যাটের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

কারামুক্ত হয়ে স্প্র্যাট মাদ্রাজের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতা সিঙ্গারাভেলুর মেয়েকে বিবাহ করেন ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীতে পরিণত হন।

## বেন ব্র্যাড্‌লি

বেন ব্র্যাড্‌লি বোম্বাই প্রদেশে সূতাকল ধর্মঘটে স্থানীয় কমিউনিস্টদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেন ঐ প্রদেশে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেন : মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী থাকার পর, মুক্ত হয়ে তিনি ইংলণ্ডে ফিরে যান।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসের সংকীর্ণতাবাদী ভ্রান্ত নীতি সংশোধিত হয়ে, ফ্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী যুক্তফ্রন্ট গঠনের রণকৌশলের আলোকে ভারতে জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে শ্রেণী-সংগ্রামকে গ্রথিত করার নতুন সঠিক কর্মসূচীর দলিল যৌথভাবে রচনা করেন রজনী পাম দত্ত ও বেন ব্র্যাড্‌লি। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এই দলিল দত্ত-ব্র্যাড্‌লি থিসিস নামে পরিচিত। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেন্ ব্রাডলি ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন ও ভারতের মুক্তি সংগ্রামের একনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন।

## লেস্টার হাচিনসন

লেস্টার হাচিনসন ছিলেন বামপন্থী সাংবাদিক ও কমিউনিস্টদের বন্ধু। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকেও বন্দী করা হয়। মীরাট মামলায় মুক্তি পাবার পর, হাচিনসনই সর্বপ্রথম এই ঐতিহাসিক ষড়যন্ত্র মামলাকে পৃথিবীর মানুষের সামনে সবিস্তারে উপস্থিত করেন, তাঁর প্রসিদ্ধ বই "মীরাট কন্স-পিরেসি কেস" মারফৎ। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গোড়াপত্তন ও বিস্তার ও তাদের শোষণ শাসনের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে তিনি একটি প্রামাণ্য বই লেখেন "এম্পায়ার অফ দি ন্যাবব্‌স"। ত্রিশের দশকের বহু কমিউনিস্ট এই বই পড়ে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছেন।

## কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা

স্প্র্যাট, ব্র্যাড্‌লি ও হাচিনসনের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হওয়া ও কঠিন সাজা পাওয়া, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইংলণ্ডে যেমন সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণী আছে, তেমনই বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীও আছে এবং কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক আদর্শবাদ তাদের শেখায় নিজের দেশে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে, পদানত দেশের নিপীড়িত মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়ে লড়তে ভারতের কমিউনিস্টরা এইসব মতবাদ প্রচার করতেন ঠিকই, কিন্তু চোখের সামনে অগণিত অত্যাচারী ইংরেজকে দেখে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কমিউনিস্টদের এইসব মতামতকে গ্রাহ্য করতেন না। মীরাট মামলার ঘটনাবলী তাঁদের চোখ খুলে দিল এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৈপ্লবিক আন্তরিকতা সম্বন্ধে তাঁদের বিশ্বাস জন্মাতে

লাগল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ ভারতের অজস্র বিনা বিচারে আটক ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত রাজবন্দীরা তখন মুক্তি সংগ্রামে এগিয়ে যাবার নতুন পথ খুঁজছেন। মীরাট মামলা তাঁদের সামনে এক আলোকবর্তিকা হিসাবেই দেখা দিল।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের মধ্যে সম্ভবত সব চাইতে ছেলেমানুষ ছিলেন উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পূরণচাঁদ যোশী। ১৯০৭, গাড়োয়ালের আলমোড়া অঞ্চলে তাঁর জন্ম। কলেজের ছাত্র হিসাবেই তিনি আকৃষ্ট হন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বামপন্থী আন্দোলনের দিকে। বেরিলি কলেজের ছাত্রনেতা রজনী মুখার্জী এবং পি সি যোশী গড়ে তোলেন উত্তর প্রদেশের সংগ্রামী যুবসংস্থা—যুব লীগ। তারপর সাম্যবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পি সি যোশী হাত লাগান উত্তর প্রদেশে ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি গড়ে তোলার কাজে। রজনী আকৃষ্ট হন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতবাদের দিকে এবং পরে বাংলাদেশে এসে এখানে রায়বাদী গোষ্ঠীর গোড়াপত্তন করেন। পি সি যোশী সংযোগ স্থাপন করেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পুরানো নেতাদের সঙ্গে, যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে, ২১ বছর বয়সে।

## পূরণচাঁদ যোশী

ছেলেমানুষ বয়সেই তাঁর সংগঠনী প্রতিভা ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯২৯-এর ২০ মার্চ তারা যখন জাল ছড়ায়, সারা ভারত জুড়ে নেতৃস্থানীয় কমিউনিস্টদের বন্দী করার জন্য, তখন তারা গ্রেপ্তার করে তরুণ পি সি যোশীকেও। মীরাটের মামলায় চার বছর বন্দী থাকার পর, আপীল আদালতে যাঁরা খালাস পান, যোশী তাঁদের মধ্যে একজন। গঙ্গাধর অধিকারীর উদ্যোগে ১৯৩৩-এ আবার সমস্ত কমিউনিস্ট গোষ্ঠীকে একত্র করে যখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হল, তখন তার সদস্য নির্বাচিত হলেন তরুণ পি সি যোশীও। শুধু তাই নয়। প্রথমে অধিকারী, তারপর ঘাটে, তারপর সোমনাথ লাহিড়ী যখন গ্রেপ্তার হয়ে দণ্ডিত হলেন, তখন ১৯৩৫-এর শেষভাগে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন পি সি যোশী। দীর্ঘ ১২ বছর ধরে, ১৯৪৭-এর শেষ পর্যন্ত তিনিই এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য নেতৃত্বে, বে-আইনী ছোট্ট কমিউ-নিস্ট পার্টি ভারতের শ্রমজীবী জনগণ ও সমগ্র জাতির জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ

শক্তিতে রূপান্তরিত হল। স্বাধীনতা সংগ্রামের নিরস্ত্র ও সশস্ত্র সমস্ত ধারার সেরা কর্মীরা এসে যোগ দিলেন সেই পার্টিতে। আকৃষ্ট হলেন ত্রিশের প্রজন্মের সেরা তরুণেরা ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা।

এই যুগের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী নেতা লিখছেন : "এই সময়ই কমিউনিস্টরা জাতীয় কংগ্রেসের মধ্য থেকে অপরাপর বামপন্থী কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে কংগ্রেসকে পরিপূর্ণ জাতীয় মুক্তির ও গণমুক্তির সংগ্রামী হাতিয়ারে পরিণত করার প্রচেষ্টায় দ্রুত অগ্রসর হল। একদিকে কংগ্রেসের বাইরে প্রতিক্রিয়াশীল রাজভক্ত অথবা সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভেদপন্থীদের বিরুদ্ধে ও অপরদিকে কংগ্রেসের মধ্যকার দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের সংস্কারবাদ ও আপসপন্থার বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। এককথায়, কমিউনিস্ট পার্টি তার রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠে জাতীয় ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী শক্তি হিসাবে দ্রুত গড়ে উঠতে পেরেছিল।" (বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় : কমিউনিস্ট হলাম, মেদিনীপুর, ১৯৭৬, পৃঃ ১০১)

## অযোধ্যাপ্রসাদ

উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা আরও একজন মীরাট বন্দী ছিলেন। তাঁর নাম অযোধ্যাপ্রসাদ। মেহনতী গরীব ঘরের ছেলে, কাজ নিয়েছিলেন তিনি বিদেশগামী জাহাজে খালাসীর। রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ও আন্তর্জাতিক জাহাজী শ্রমিক সংস্থার সংস্পর্শে এসে তিনি গ্রহণ করেন কমিউনিস্ট মতবাদকে। যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। তাঁর উপর পার্টি দিয়েছিল এক অত্যন্ত কঠিন ও গুরুদায়িত্ব—কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ও সারা দুনিয়ার কমিউনিস্ট নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সংযোগ রক্ষা করা। বেশ কয়েক বছর, বহু বিপদ মাথায় করে অযোধ্যাপ্রসাদ সেই কঠিন দায়িত্ব সার্থকভাবেই পালন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টের পেয়ে যায় ইংরেজ গোয়েন্দারা। আর তাই ১৯২৯-এর ২০ মার্চ তাঁকেও গ্রেপ্তার করে অভিযুক্ত করা হয় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাতে।

মীরাট মামলায় জড়িত কমিউনিস্ট বন্দীদের পরিচয় মোটের উপর সমাপ্ত হল। এ ছাড়াও বেশ কয়েকজন অ-কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাও বন্দী

ছিলেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাতে, যেমন কিশোরীলাল ঘোষ বা শিবনাথ ব্যানার্জী। কিশোরীলাল ঘোষ বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্যতম নেতা ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নরমপন্থী কিন্তু শ্রমিক-শ্রেণীর প্রতি বিশ্বস্ততাই তাঁর কারাদণ্ডের প্রধান কারণ। শিবনাথ ব্যানার্জি কমিউনিস্ট না হলেও সমাজতন্ত্রী ছিলেন এবং কাবুল থেকে দুর্গম হাঁটা পথে হিন্দুকুশ পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন। লিলুয়ার রেল ধর্মঘটের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান সংগঠক। তাই তাঁকেও গোয়েন্দারা জড়িত করেছিল মীরাট ষড়যন্ত্র মামলাতে।

১৯২৯-এর মার্চ মাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের বিচার শুরু হয়। আর দীর্ঘ চার বছর পরে ১৯৩৩-এর ১৬ জানুয়ারি মীরাটের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক আর এল ইয়র্ক তাঁর রায় দেন। রায়ের বিরুদ্ধে অভি-যুক্তরা এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল করেন। ১৯৩৩-এর ৩ আগস্ট আপীল আদালত তার রায় দিলে ঐতিহাসিক মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অবসান হয়।

## ঐতিহাসিক মামলা

এত দীর্ঘ ও বিশাল মামলা পৃথিবীর ইতিহাসে কমই হয়েছে। "যত সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছিল তা ফুলস্ক্যাপ সাইজের বাঁধানো ২৫ খণ্ডে রক্ষিত আছে। ফরিয়াদী সরকারের তরফ থেকে ৩৫০০ দলিল প্রদর্শিত হয়েছিল, আসামীরা প্রদর্শন করেছিলেন ১৫০০ দলিল। সর্বসমেত ৩২০ জন ব্যক্তি আদালতে সাক্ষী দেন। মীরাটের দায়রা বিচারকের রায় ছাপতে ৬৭৬ ফুলস্ক্যাপ পাতা লেগেছিল" (১৯৩৩, ৩ আগস্ট, এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল আদালতের রায় থেকে)।

মীরাটের দায়রা বিচারক তিনজন অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস দিয়ে-ছিলেন—কলকাতার দুই ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী শিবনাথ ব্যানার্জি ও কিশোরীলাল ঘোষ এবং গোরক্ষপুরের চিকিৎসক বিশ্বনাথ মুখার্জী। বিচারক যখন রায় লিখছেন তখন ৬৮ বছরের অভিযুক্ত বন্দী ও বোম্বাইয়ের ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস্ পার্টির সভাপতি ডি আর থেংডি মারা গেলেন। বাকী ২৭ জন বন্দীকে বিচারক ইয়র্ক নিম্নলিখিত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে রায় ঘোষণা করলেন:

মীরাট মামলার রায়

| | | |
|---|---|---|
| ১। | মুজফ্‌ফর আহমদ | : যাবজ্জীবন কারাদণ্ড |
| ২। | এস এ ডাঙ্গে | : ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড |
| ৩। | ফিলিপ স্প্র্যাট | ঐ |
| ৪। | এস ভি ঘাটে | ঐ |
| ৫। | কে এন যোগলেকর | ঐ |
| ৬। | আর এস নিম্ব্‌কর | ঐ |
| ৭। | বি এফ ব্র্যাড্‌লি | : ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড |
| ৮। | এস এস মীরাজকর | ঐ |
| ৯। | শউকত উসমানি | ঐ |
| ১০। | মীর আবদুল মজিদ | : ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড |
| ১১। | সোহন সিং যোশ | ঐ |
| ১২। | ধরণী গোস্বামী | ঐ |
| ১৩। | অযোধ্যা প্রসাদ | : ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড |
| ১৪। | গঙ্গাধর অধিকারী | ঐ |
| ১৫। | পূরণ চাঁদ যোশী | ঐ |
| ১৬। | এম জি দেশাই | ঐ |
| ১৭। | গোপেন চক্রবর্তী | : ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড |
| ১৮। | গোপাল বসাক | ঐ |
| ১৯। | লেস্টার হাচিনসন | ঐ |
| ২০। | রাধারমণ মিত্র | ঐ |
| ২১। | কে এন সেগল | ঐ |
| ২২। | এস এইচ ঝাবওয়ালা | ঐ |
| ২৩। | সামসুল হুদা | : ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড |
| ২৪। | এ এ আলওয়ে | ঐ |
| ২৫। | জি আর কাসলে | ঐ |
| ২৬। | গৌরী শঙ্কর | ঐ |
| ২৭। | এল আর কদম | ঐ |

ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ও এককালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের

অন্যতম নেতা মানবেন্দ্রনাথ রায় ভারতে ফিরে এসে ধরা পড়ে যান। নিম্ন আদালতে তাঁরও ১২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। তখন প্রসিদ্ধ কংগ্রেসসেবী ডাঃ কৈলাস নাথ কাটুজ মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সপক্ষে আপীল আদালতে মামলা লড়ে তাঁর সাজা ১২ থেকে কমিয়ে ৬ বছরে দাঁড় করান। মীরাট বন্দীরাও এলাহাবাদ হাইকোর্টে আপীল করতে মনস্থ করেন। তাঁদের পক্ষে আইনজীবী হিসাবে দাঁড়ান জওহরলাল নেহরুর ভগ্নীপতি রঞ্জিত সীতারাম পণ্ডিত ও আত্মীয়া শ্রীমতী শ্যামকুমারী নেহরু। পি সি যোশীর বন্ধু বঙ্কা বেহারিও সাহায্য করেন। পরে বন্দীদের পক্ষে প্রধান আইনজীবীর ভূমিকা নেন ডঃ কৈলাশ নাথ কাটজু। কমিউনিস্টস্ চ্যালেঞ্জ ইম্পিরিয়ালিজম ফ্রম দি ডক, মুজফ্‌ফর আহমদ রচিত ভূমিকা থেকে)

## আপীল আদালতের রায়

মীরাট বন্দীদের উপর কঠোর সাজার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণী জোরালো প্রতিবাদ জানাতে থাকলেন। বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করলেন রোমা রোলাঁ, আইনস্টাইন, বার্ণাডশ' প্রমুখ মনীষীবৃন্দও। সব মিলে আপীল আদালতের রায়ে মুজফ্‌ফর আহমদ, এস এ ডাঙ্গে, শউকৎ উসমানি ও ফিলিপ স্প্র্যাট ছাড়া বাকী সবাই হয় খালাস পেলেন, নয়তো যা জেল ভোগ করেছেন তারই ভিত্তিতে মুক্তি পেলেন।

এই চারজনেরও দণ্ড কমিয়ে, স্প্র্যাটকে ২ বছর ও বাকী তিন জনকে ৩ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল।

সন্দেহ নেই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতের তরুণ কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সাময়িকভাবে নেতৃত্ববিহীন করে, একটা বড় আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু তাতে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিধ্বস্ত হয় নি, জাতীয় আন্দোলন বা সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্নও হয় নি। বরঞ্চ ৪ বছর ধরে মীরাটের আদালতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ও মার্কসবাদী ভাবাদর্শ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী রণকৌশলের সপক্ষে বন্দীদের তথ্যসমৃদ্ধ ও যুক্তিপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন বক্তব্য, কারান্তরালে বন্দী হাজার হাজার জাতীয় বিপ্লবী ও অহিংস সংগ্রামীর মনে গভীর নাড়া দিয়েছিল ও তাঁদের সুবৃহৎ অংশ জেলের মধ্যেই বা জেল থেকে বেরিয়েই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ

দিয়েছিলেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে পরাজয়ই হয়েছিল।

আগেই বলা হয়েছে যে পৃথিবীর বহু প্রসিদ্ধ মনীষী মীরাট বন্দীদের মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন। ফরাসী মনীষী রোমাঁ রোলাঁ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পৃথিবীতে যেখানে যখন সাম্রাজ্যবাদ বা স্বৈরাচার দানবীয় অত্যাচার শুরু করেছে, তখনই তাদের বিরুদ্ধে ও সংগ্রামী মানুষের সপক্ষে কলম ধরেছেন রোলাঁ—ইন্দোচীনে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট কারাগারে ইতালীর অবিস্মরণীয় কমিউনিস্ট নেতা গ্রামশ্চির উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত বিপ্লবের সপক্ষে। তেমনই কলম তিনি ধরেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বীর বন্দীদের সপক্ষে। ইংরেজি ভাষাতে তাঁর এই সব অগ্নিবর্ষী লেখাগুলি অনুবাদ ও একত্রিত করে ছাপা হয় এই শতাব্দীর ত্রিশের দশকেই : "আই উইল নট রেস্ট" নাম দিয়ে। অনুবাদ করেন প্রসিদ্ধ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী কে এ শেলভাঙ্কার। তার থেকেই বিবৃতির অংশবিশেষের স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ এখানে ছাপা হল :

## মীরাট বন্দীদের সপক্ষে রোমাঁ রোলাঁ

"এখন ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস খুব ধুমধাম করে ডেরবেস্টরের শহীদ শ্রমিকদের আসন্ন শতবার্ষিকী পালনের আয়োজন করছে।

১৮৩৫-এ ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার 'অপরাধে' এই শ্রমিকরা শহীদ হয়েছিলেন, তাই আজ ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের স্রষ্টা বলে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাবার উদ্যম চলছে। অথচ ঠিক এই সময়ই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শুরু করার 'অপরাধে' ভারতে কয়েকজন কর্মীকে মীরাটের আদালত যাবজ্জীবন, বারো, দশ, সাত ও পাঁচ বছর কঠোর করোদণ্ডের আদেশ দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে আছেন তিনজন মহৎ ইংরেজ—ফিলিপ স্প্র্যাট, বেন্ ব্র্যাড্‌লি ও লেস্টার হাচিনসন। সৌভ্রাত্রবোধ থেকেই এঁরা ভারতীয় বন্ধুদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের একমাত্র অপরাধ—এঁরা ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। সেদেশে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজ নরকযন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাদের সংঘবদ্ধ যেকোনও উদ্যমকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে চায়। পৃথিবীর

শ্রমিকশ্রেণী কি সেই অপচেষ্টাকে বাধা দেবে না? চুপ করে মুখ বুজে থাকবেন পৃথিবীর লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা?

## শিকল ভাঙছে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী

ভারতীয় শ্রমিকদের উপর যে নিদারুন শোষণ চলছে, তাদের আধপেটা, আধমরা রেখে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা যেভাবে তাদের স্বাধীন সত্তাকেই বিলুপ্ত করতে চাইছে, আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ করছি। যে সব বীরেরা এই সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের গ্রেপ্তার করা ও কারাদণ্ড দেবার নির্দেশের বিরুদ্ধে আমরা তীব্র ধিক্কার দিচ্ছি।

তাঁদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে তাঁরা ইংলণ্ডের সম্রাটকে ভারতে তাঁর সার্বভৌম অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র করেছেন। এ কাজ যদি অপরাধ হয়, তবে প্রত্যেক গণতন্ত্রীই অপরাধী। যে দেশে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের জন্ম, সেই দেশই ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে দমন করবে—এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে?

সাম্রাজ্যবাদের শিকল ছেঁড়বার জন্য সারা পৃথিবী জুড়ে আজ যে বিরাট লড়াই চলছে, তাতে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আত্মাহুতি দিয়েছে, আমাদের চোখে মীরাট মামলার আসামীরা, সেই সংগ্রামেরই জীবন্ত প্রতীক। এদের জীবন ব্যর্থ হয়নি। এঁদের সংগ্রামী জীবনের মধ্যে আমরা বিপ্লবের জয়ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। যে নতুন বিপ্লবী আলোড়ন মানব সমাজকে আবেগমথিত করে তুলেছে, মীরাট মামলার আসামীরা তারই অনিবার্য জয়ের কথা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এদের অগ্রগতি রোখে, সাধ্য কার?"

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হল। ৪ বছর কমিউনিস্ট নেতারা বন্দী থাকায়, ভারতের তরুণ কমিউনিস্ট আন্দোলন বেশ খানিকটা ধাক্কা খেল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের মূল দুটি উদ্দেশ্য ব্যর্থ হল—ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন চূর্ণ হল না এবং জাতীয় আন্দোলনের মূল ধারা থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্নও করা গেলনা। বরঞ্চ মীরাট আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনে কমিউনিস্টদের সাহসী রাজনৈতিক বক্তব্য সারা দেশের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হল। ইতিমধ্যে আবদুল হালিম, রণেন সেন ও সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র ক্যালকাটা কমিটির নামে সারা ভারতে

কমিউনিস্ট ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে একটি খসড়া দলিল ছাপা হয়। পাঞ্জাবের কমিউনিস্টরা সাড়া দেন এই ঐক্যের আহ্বানে। সদ্য কারামুক্ত ডঃ অধিকারী ও পি সি যোশী এবং বাংলা ও পাঞ্জাবের কমিউনিস্টরা সচেষ্ট হন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পুনরায় গড়ে তুলতে।

## ১৯৩৩—নতুন ঐক্যের নেতৃত্ব

"১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় সর্বভারতীয় সম্মেলন বসে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে ঐ তারিখ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে" (রনেন সেন ঃ বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ)। বাংলা থেকে ঐ সম্মেলনে যোগ দেন আবদুল হালিম, রণেন সেন ও সোমনাথ লাহিড়ী, বোম্বাই থেকে গঙ্গাধর অধিকারী, এম জি পাটকর, নাগপুর থেকে এস এল জয়মন্ত, উত্তর প্রদেশ থেকে পি সি যোশী ও পাঞ্জাব থেকে গুরদিৎ সিং।

সম্মেলনে ডাঃ অধিকারীর রচিত খসড়া রাজনৈতিক থিসিস পাশ হয় ও সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে নিয়েই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'র নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেন কমরেড অধিকারীকে। "১৯৩৪-এর গোড়ায় ঐ থিসিসটা ইনপ্রেকরে ছাপা হয়। অর্থাৎ কমিন্টার্ন স্বীকার করে নিল আমাদের। সেদিনের আনন্দ ও গর্ব রাখার আমাদের স্থান ছিল না।" (রণেন সেন ঃ বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ, পৃঃ ৬৬)

## আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার

১৯৩৪-এর মে মাসে গান্ধীজি ও কংগ্রেস নেতৃত্ব বিনাশর্তে দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিলেন। বুর্জোয়া নেতৃত্বের তখন পিছু হঠার যুগ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও সাড়া দিল—১৯৩৪, জুন মাসে তারা প্রত্যাহার করল কংগ্রেসের উপর থেকে সমস্ত রকম নিষেধাজ্ঞা। এর সমালোচনা শুধু কমিউনিস্টরা বা বামপন্থীরা করলেন তাই নয়। কারারুদ্ধ জওহরলাল এই সংবাদ পড়ে সাক্ষাতে লিখলেন ঃ

"জেলে বসে 'স্টেটসম্যানে' খবর পড়লাম যে গান্ধীজি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন। অবাক হয়ে, ভগ্নহৃদয়ে আমি খবরটি পড়লাম

সমগ্র বিবৃতিটি আমাকে স্তম্ভিত করে তুলল"। (নেহরু : ট্‌ওয়ার্ডস ফ্রীডম, পৃ ৩০, )

## কমিউনিস্ট পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা

আর ঠিক এই সময়েই, যখন বুর্জোয়া নেতারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ক্লীব আপসের পথে পা বাড়াচ্ছিলেন। তখন মাথা তুলে দাঁড়ালেন ভারতের বাহাদুর শ্রমিকশ্রেণী। ১৯৩৪-এ ধর্মঘট করলেন, সরকারি হিসাব মতে, ২,২০,৮০৮ জন শ্রমিক—১৯৩৩-এর দ্বিগুণ। এর মধ্যে ছিল বোম্বাইয়ের সূতাকল শ্রমিকদের কয়েকমাসব্যাপী বীরত্বপূর্ণ সাধারণ ধর্মঘট। এরই পটভূমিতে সাম্রাজ্যবাদও শ্রমিকশ্রেণী ও তার অগ্রণী বাহিনীকেই আবার বেছে নিল প্রধান শত্রু বলে। ১৯৩৪-এর জুলাই মাসে ব্রিটিশ সরকার এক ঘোষণা জারি করে বেআইনী করে দিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সমস্ত শাখা সংগঠনদের—দীর্ঘ এক দশকের জন্য। ইতিহাসের এক পর্ব শেষ হয়ে আর এক কালো পর্বের সূচনা দেখা দিল।

ঐ যুগের একজন সেরা কমিউনিস্ট নেতার কথা দিয়েই এ পর্বের আলোচনার ছেদ টানছি :

"নতুন ঐক্যের মহৎ প্রেরণা ছড়িয়ে পড়ল শ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে—যার পরিচয় ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাই সুতাকল শ্রমিকদের জেনারেল স্ট্রাইকে, ভারতব্যাপী ধর্মঘটের তরঙ্গে। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে এক নতুন বিপ্লবী শক্তির নব অভ্যুদয় তখন সুস্পষ্ট। অন্ধকার যুগ থেকে তখন আমরা আলোর পথে।" (সোমনাথ লাহিড়ী : অন্ধকার থেকে আলোয়, কালান্তর বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬৬)

পরিশিষ্ট "ক"

# ভগৎ সিংদের ফাঁসী দেওয়া হয়েছে শুনে মীরাট বন্দীদের তীব্র ধিক্কার

"মহামান্য বিচারক,

এক জঘন্য মৃত্যুদণ্ডের ভয়ঙ্কর ছায়ার নীচে আজ আমরা দাঁড়িয়ে আছি এই আদালত কক্ষে। আমাদের সহযোদ্ধা ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবকে, সাম্রাজ্যবাদী বিচারের প্রহসন করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে—শ্বেত সন্ত্রাসের কাপুরুষোচিত কাজ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বর্বর শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস তাঁরা দেখিয়েছিলেন—তাই এই বীরদের ফাঁসী দেওয়া হ'ল।

ভারতের স্বাধীনতা বিপ্লবের এই শহীদদের আমরা সেলাম জানাই!

তাঁদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে আমরা জানাই গভীর শ্রদ্ধা!

তাঁদের সহযোদ্ধা, বন্ধু ও আত্মীয়দের আমরা জানাই গভীর সমবেদনা!

আপনার কাছে আমরা দাবী জানাই যে আমাদের এই প্রতিবাদ আপনি ঐ বীরদের আত্মপক্ষ সমর্থন কমিটির কাছে প্রেরণ করুন!

ইতি

মীরাট মামলার বন্দীরা"

( সব কজন বন্দীর স্বাক্ষরসহ, মীরাট, ২৪ মার্চ, ১৯৩১ )

পরিশিষ্ট "খ"

# মীরাট বন্দীদের সঙ্গে গান্ধীজির সাক্ষাৎকারের একাংশ

"মীরাট জেলে বন্দীদের সঙ্গে গান্ধীজি দেখা করতে এলে, আর এস নিম্বকর তাঁকে প্রশ্ন করেন যে গান্ধীজি কেন ১৯২৮-এর সূতাকল সাধারণ ধর্মঘটের সময় শ্রমিকদের সাহায্য করেন নি? গান্ধীজি উত্তর দেন যে তাঁর ধারণা শ্রমিকরা অন্যায় করেছিল। তিনি আরও বলেন যে ধর্মঘটের কোনও নেতা তাঁকে কিছু বুঝাতে আসেন নি।

এস এ ডাঙ্গে প্রতিবাদ করে বলেন যে কেন্দ্রীয় ধর্মঘট কমিটির প্রতিনিধিরা গিয়ে গান্ধীজির কাছে সমগ্র পরিস্থিতি বিবৃত করেছিল। তাছাড়া তিনি নিজে আমেদাবাদ সূতাকল শ্রমিক নেতাদের সমস্ত পরিস্থিতি খুলে বলেছিলেন এবং তাঁরা তা গান্ধীজির কাছে রিপোর্টও করেছিলেন।

এম জি দেশাই বলেন যে ধর্মঘটের সময় ধর্মঘটীদের ক্ষুধার্ত স্ত্রী-পুত্রদের তো গান্ধীজি সাহায্য করতে পারতেন।

মীরাজকর, যোগলেকর ও শিবনাথ গান্ধীজিকে বলেন যে শ্রমিক ও কৃষকদের কিভাবে কংগ্রেসের পিছনে টানবেন, যদি তাদের সংগ্রামকে আপনি সমর্থন না করেন?"

(লিবার্টি, কলকাতা, ১ নভেম্বর, ১৯২৯)